মাওলানা শহীদ জিয়াউর রহমান ফারুকী (রহ.)

بسم الله الرحمن الرحيم

আকাবিরদের জিহাদী জীবন
মূল
মাওলানা শহীদ জিয়াউর রহমান ফারুকী (রহ.) (সংকলিত ইউরোপ কে সংগিন মুজরেম নামক ঐতিহাসিক উর্দূ গ্রন্থ অনুসরণে রচিত)

রূপান্তর
মাওলানা ইমামুদ্দিন শরীফ
ইমাম, সড়ক ও জনপদ কোয়ার্টার্স মসজিদ আগানগর, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা

সম্পাদনা
মাওলানা মুশতাক আহমদ শরীয়তপুরী

মুদাররিস, জামি'আ ইসলামিয়া আরাবিয়া তাঁতীবাজার, ঢাকা-১১০০

মাকতাবাতুল আশরাফ (অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান) ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আকাবিরদের জিহাদী জীবন

মূল: শহীদ মাওলানা জিয়াউর রহমান ফারুকী (রহ.)

রূপান্তর: মাওলানা ইমামুদ্দীন শরীফ

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

মাকতাবাতুল আশরাফ

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান) ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন: ৭১৬৪৫২৭
মোবাইল: ০১১-৮৩৭৩০৮, ০১৭১-১৪১৭৬৪

প্রকাশকাল :
রজব ১৪২৪ হিজরী সেপ্টেম্বর ২০০৩ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ: ইবনে মুমতায গ্রাফিক্স : নাজমুল হায়দার কালার ক্রিয়েশন, ঢাকা

মুদ্রণ: মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স (মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান) ৩/খ, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০
ফোন: ৭৩৯৫২৭৪

মূল্য: সত্তর টাকা মাত্র

Akabirder Jihadee Jibon
By Maulana Ziaur Rahman Faruki (RH:) Translated by Maulana Emamuddin Sharif Price Tk. 70.00 U.S. $ 4.00 only

উৎসর্গ

মুজাহিদে মিল্লাত, আওলাদে রাসূল, হযরত মাওলানা
মুস্তাফা মাহমুদ আল মাদানী (রহঃ) -এর পূণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে।
দ্বীন ও দ্বীনি শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের মহান ব্রত নিয়ে যিনি
সুদূর আরব দেশ থেকে এদেশে এসেছিলেন।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যিনি সমগ্র বাংলায় শিরক, বি'দআত ও
কুফুরের বিরুদ্ধে সহীহ দাওয়াত দিয়েছেন। বার বার
ভণ্ড প্রতারক ও দ্বীনদ্রোহী বি'দআতী সম্প্রদায়ের
চোরা-গোপ্তা হামলায় আক্রান্ত হয়েছেন। পরিশেষে দ্বীন বিরোধী চক্রের হাতেই শাহাদাত বরণ
করেছেন। আল্লাহপাক বেহেশতে তাঁকে উচ্চ মাকাম দান করুন। আমীন।

প্রকাশক

আপনার সংগ্রহে রাখার মতো জিহাদ বিষয়ক কয়েকটি বই

আয়াতুল জিহাদ
সংকলন ও সম্পাদনা

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান মূল্য: ১৫০.০০ টাকা

কাশ্মীর রণাঙ্গনে
মূল: মাওলানা মুহাম্মাদ মাসঊদ আযহার অনুবাদ: আবূ উসামা
মূল্য: ১২০.০০ টাকা

আযাদী ও লড়াই
মূল: মাওলানা মুহাম্মাদ মাসঊদ আযহার অনুবাদ: আবূ উসামা
মূল্য: ১৩০.০০ টাকা

আফগান জিহাদের অজানা কাহিনী-১ আল্লাহর পথের মুজাহিদ
মূল: মুফতি মুহাম্মাদ রফী উসমানী অনুবাদ: আবূ উসামা
মূল্য: ১৪০.০০ টাকা

আফগান জিহাদের অজানা কাহিনী-২

জানবাজ মুজাহিদ

মূল: মুফতি মুহাম্মাদ রফী উসমানী

অনুবাদ: আবূ উসামা

মূল্য: ১৪০.০০ টাকা

"আকাবিরদের জিহাদী জীবন" -এর মূলগ্রন্থ 'ইউরোপ কে সংগিন মুজরেম' সম্পর্কে লাহোরের বিখ্যাত পত্রিকা 'খুদ্দামুদ দ্বীন' –এর সম্মানিত সম্পাদক জনাব সাঈদুর রহমান উলূভী সাহেবের

অভিমত

ইতিহাস বিকৃতকরণ একটি ঘৃণিত ও লজ্জাজনক অপরাধ। এই কাজে লিপ্ত হওয়া এক শ্রেণীর হীনমনা ও নির্বোধ লোকেরই কাজ। এখনো করাচীর একটি মাসিক পত্রিকা এই লাঞ্ছনার বোঝা বহন করে হিন্দুস্তানের সকল ঐতিহাসিকদের পেরেশান করে রেখেছে। অত্যন্ত সতর্কতা ও প্রতারণামূলকভাবে সে পত্রিকাটি গোলামীর শৃংখল থেকে মুক্তি দানের জন্য উৎসর্গিত স্বাধীনতাকামী এবং বিপরীত মেরুতে পরাধীনতার জিঞ্জীর সকলের গলায় পরিয়ে দিতে উদগ্রীব এমন সকলকে একই প্লাটফর্মে এনে দাঁড় করিয়েছে।

সুধী পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া বর্তমান গ্রন্থটির প্রতিটি শব্দই ভারত উপমহাদেশের অতীত ইতিহাসের স্বচ্ছ দর্পণ থেকে অত্যন্ত দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সাথে চয়ন করা হয়েছে। এই বইয়ে ইউরোপীয় বণিকবেশী শাসকদের ইতিহাস যদিও যারপরনাই সংক্ষিপ্ত; তবুও তা তত্ত্ব ও তথ্যগত দিক থেকে অত্যন্ত গবেষণালব্ধ ও নির্ভরযোগ্য। এই বইয়ে এক দিকে যেমন পাওয়া যাবে ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গী মুজাহিদদের রক্তাক্ত পরিচয়, তেমনি অন্য দিকে প্রকাশ পাবে বিবেক শূণ্য লেখকদের মুখ থেকেই এর হাকীকত ও সততার স্বীকারোক্তি।

এই বইটি সর্বশ্রেণীর পাঠকের জন্যই সঠিক ইতিহাসের এক দিশারী। এর উপকারিতা

পৃথিবীর যে কোন দেশের অধিবাসীদের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বইটি ইসলামী জগতের প্রতিটি মানুষের দৃষ্টিগোচর হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, বেশ কিছুদিন যাবত এর ইংরেজী অনুবাদ বিপুল পরিমাণে প্রকাশ হচ্ছে। এই প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে আমাদের স্বশ্রদ্ধ বন্ধু লেখক জনাব মাওলানা জিয়াউর রহমান ফারুকী সাহেব অনেক অনেক মুবারকবাদ ও অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য যে, তাঁর বলিষ্ঠ ও ক্ষুরধার লিখনী আমাদের জন্য উপকারের দুয়ার খুলে দিয়েছে। তিনি আমাদেরকে পৌঁছে দিয়েছেন মহাপ্রাপ্তির চরম শিখরে।

সায়ীদুর রহমান উলুভী

২৫ জানুয়ারী ১৯৭৬ ইং

লেখকের ভূমিকা

দেশ বিভক্তির পর ভারতবর্ষের আযাদী আন্দোলনের অগ্রনায়ক মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) -এর সুযোগ্য সন্তান 'জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ' এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক আল্লামা আসআদ মাদানী (রহঃ) বৃটিশ প্রশাসনের কাছে এই মর্মে একটি দরখাস্ত করেন যে, উপমহাদেশের সুদীর্ঘ দু'শ বছরের ইংরেজ শাসনকালে ইংরেজ বিরুধী এবং ইংরেজ অনুগত ও মদদপুষ্টদের একটি তালিকা বৃটিশ সরকারের গোপন রেকর্ড থেকে যেন তাকে সরবরাহ করা হয়। যার সাহায্যে উপমহাদেশের ঐতিহাসিক আযাদী আন্দোলনের স্বচ্ছ, নির্ভুল ও পরিপূর্ণ ইতিহাস সংকলন করা সম্ভব হয়। তখন বৃটিশ সরকার তার অনুগতদের তালিকা সরবরাহের ব্যাপারে মৌনতা অবলম্বন করলেও (পরবর্তিতে) লন্ডনস্থ ইন্ডিয়ান

লাইব্রেরী থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ইংরেজ বিরোধীদের একটি তালিকা মাওলানা আসআদ মাদানী সাহেবের নিকট প্রেরণ করে।

ইতিহাসের এই ক্ষুদ্র পুষ্পস্তবকে বৃটিশ সরকার কর্তৃক সরবারহকৃত রিপোর্ট অনুযায়ী ইংরেজদের কৃষ্টি-কালচার ও তাদের দুঃশাসন বিরোধী সেসব আলেম-উলামা ও সমালোচকদের স্মৃতিচারণ করা হবে যাঁরা ১৯১২ ইং সাল তথা 'রেশমী রুমাল আন্দোলনে'র শুরু থেকে উপমহাদেশ বিভক্তি পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে ইংরেজ দুঃশাসনের মোকাবেলা করে তাদের রোষাণলে পড়ে জেল-জুলুম, অত্যাচার-অবিচার ও নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়েছেন।

পরিসরের স্বল্পতা হেতু এই কিতাবে
বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের আলোচনা করতে না পেরে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

☑ এটি পাক-ভারত উপমহাদেশের সঠিক ইতিহাসের সৌরভ ছড়ানো ফুলের মত - যার সুঘ্রানে ইনশাআল্লাহ মিথ্যা ও বানোয়াট ইতিহাসের উৎকট দুর্গন্ধের বিষক্রিয়া থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যাবে।

☑ বইটি মুসলিম বিশ্বের সে সকল যুগান্তকারী ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গের উজ্জ্বল স্মৃতিচারণ, যাঁরা নিজ নিজ যুগের ভয়াল অন্ধকার আকাশে হেদায়াত ও সফলতার উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে উদ্ভাসিত হয়েছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এ বইটি ইসলামী বিশ্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যতিক্রমধর্মী একটি সংযোজন। কারণ ভারত উপমহাদেশ ও আফ্রিকা মহাদেশকে দু'শ বছর গোলামীর শৃংখলে আবদ্ধকারী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের চরম বিরোধী ও কঠোর সমালোচকদের আলোচনা সম্বলিত ও এ সংক্রান্ত সঠিক তথ্য সমৃদ্ধ কোন বই এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। সম্ভবত এটাই প্রথম। দ্বিতীয়তঃ এতে আলোচিত সংগ্রামী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পাক-ভারত ও আফগানিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের বরেণ্য ব্যক্তিত্ব আছেন। এ জন্যই বইটি সকলের নিকট বেশ সমাদৃত।

☑ ইতিহাসের এই সংক্ষিপ্ত বইয়ে সেসব মুসলিম মনীষীরাই স্থান পেয়েছেন যাঁরা বৃটিশ আধিপত্য ও ইউরোপী ভেল্কিবাজি থেকে

মুসলিম জাতিসত্ত্বাকে সর্বতোভাবে মুক্ত করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

☑ বইটিতে অত্যন্ত নিরপেক্ষতার সাথে স্বাধীন ও মুক্তমনে বাস্তব ঘটনাবলীর যথাযথ বিবরণ সুধী পাঠক মহলের সামনে পেশ করা হয়েছে।

☑ বইটি সংকল কালে লেখকের কোন দল বা সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ততা বা অন্তরঙ্গতা বইয়ের নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছ তথ্য পরিবেশনে কোন প্রকার ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারেনি। এমনকি ঘটনাবহুল এ ইতিহাস চিত্রায়নে দল বা সংগঠনের প্রতি তার দুর্বলতা ও আকর্ষণ বইটিতে (আলহামদুলিল্লাহ) মোটেও স্থান পায়নি।

☑ মানবতার মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গকারী, দেশ ও জাতির জন্য সর্বস্ব ত্যাগী এবং পূর্বসূরী সংগ্রামী উলামায়ে কেরামের মতাদর্শ ও চিন্তা-চেতনাকে অভিনব ধারায় ভবিষ্যত প্রজন্মের হৃদয়পটে অংকন করে তাদেরকে সেই আদর্শের ছাঁচে ঢেলে সাজাতে এবং তাদের জীবনের গতিধারাকে আলোকোদ্ভাসিত করার নিমিত্তেই লেখকের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

☑ লেখকের একান্ত বাসনা, সুধী পাঠক মহল বইটি অত্যন্ত মনোযোগ ও গুরুত্ব সহকারে

এবং নিরপেক্ষ বিচার বিশ্লেষণ করে অধ্যয়ন করবেন। কারণ যেহেতু বইটি ইংরেজ দুঃশাসনের রক্তমাখা ইতিহাসের স্বচ্ছ দর্পণের 'এ' পিঠ । তার 'বি' পিঠ হল মুসলমান নামধারী কিছু বিশ্বাসঘাতক, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের উচ্ছিষ্টভোগী এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের লেলিয়ে দেয়া কিছু মানুষরূপী দানবের হাতে বিকৃত ইতিহাসের কুৎসিত দর্পণ।

সুতরাং আশা করি সুধী পাঠকবৃন্দ গভীর মনোযোগ সহকারে এই আয়নার উভয় পিঠ অধ্যয়ন করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হবেন যে, বাস্তবে কারা ইংরেজদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে জীবন বাজি রেখে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলন, কারা জীবন বিসর্জন দিয়ে স্বাধীনতার পথ সুগম করে দিয়েছেন এবং কারা এতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিলেন। বইটি পাঠ করলেই বিষয়টি পাঠকের সামনে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে ।

জিয়াউর রহমান ফারুকী

দারুততাছন
ীফ, সামান্দরী, ফয়সালাবাদ

মাকতাবাতুল আশরাফ কর্তৃক প্রকাশিত

শ্রেষ্ঠ কয়েকটি বই

তাযকিরাতুল আখেরাহ্
(গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি ভাষণ)
প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান মূল্য: ২০০.০০ টাকা

শাশ্বত সত্যের পয়গাম (১১টি
বয়ান সংকলন)
মূল: মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নোমানী (রহঃ)

অনুবাদ: মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ মূল্য: ১০০.০০ টাকা

বেহেশতের পথ ও পাথেয়

বাংলা বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ্ হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ) -এর বাণী সংকলন মূল্য: ৯০.০০ টাকা

আত্মশুদ্ধি

মূল: মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ) অনুবাদ: মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান খান মূল্য: ৭০.০০ টাকা

আল্লাহওয়ালা

মূল: মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ) অনুবাদ: মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান খান মূল্য: ৬০.০০ টাকা

আখেরাতের পাথেয় (মাওয়ায়েযে
আবরার-১)

মূল: মুহিউস সুন্নাহ মাওলানা আবরারুল হক সাহেব

অনুবাদ: মাওলানা হাসাব সিদ্দিকুর রহমান

মূল্য: ১০০.০০ টাকা

আমার কথা

মানুষ মাত্রই অনুকরণ প্রিয়, এটা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত জীবনের বিভিন্ন স্তরে মানুষ বিভিন্ন শ্রেণীর লোক জনকে বিভিন্নভাবে অনুকরণ অনুসরণ করে। ফলে কেউ খোঁজে পান সোনালী জীবন, সৌরভান্বিত হন বেহেশতী খুশবুতে। পক্ষান্তরে কেউ নিক্ষিপ্ত হন চরম আস্তাকূঁড়ে।

বৃটিশ বেনিয়াদের স্বৈরশাসনের করাল গ্রামে এক সময় আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি তথা উপমহাদেশের আকাশ-বাতাস, মাটি ও পানি ত্রাহি ত্রাহি আর্তনাদ করেছিল, নির্যাতনক্লিষ্ট নিরীহ আবাল-বৃদ্ধ বনিতার গগন বিদারী আর্তচিৎকারে তখন সামিল হয়েছিল গাছ-গাছালি লতা-গুল্মও। তখন কতেক ইলমে ওহীর ধারক, সমাজের নিঃস্বার্ত ব্যক্তিত্ব, ইতিহাসের সোনালী পুরুষ, আযাদী আন্দোলনের অনুসরনীয় ও বরেণ্য ব্যক্তিত্ব, আমাদের কতেক আকাবিরে আসলাফ বাতিলের সর্বপ্রকার নির্যাতন নিপীড়ন, বাধা ও রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে মানবতার মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাদের সেই জিহাদী জীবনের যথার্থ রূপায়ণ ও উপস্থাপনা করেছেন বিশিষ্ট আলেমেদ্বীন সংগ্রামী নেতা শহীদ মাওলানা জিয়াউর রহমান ফারুকী (রহঃ) তাঁর "ইউরোপ কে সংগিন মুজরেম" বইয়ে বইটি উর্দূ ভাষায় রচিত বিধায় আমাদের পূর্বসূরীদের জিহাদী জীবনের ইতিহাস বাংলাভাষীদের কাছে বরাবরের ন্যায় অজানাই থেকে যায়। তাই মাকতাবাতুল আশরাফ প্রকাশনার স্বত্বাধিকারী আমার স্বশ্রদ্ধ উস্তাদ জনাব মাওলানা হাবীবুর রহমান ছাহেব আমার শত অযোগ্যতা সত্ত্বেও আমাকে বইটি অনুবাদের দায়িত্ব দেন। ফলে তাঁর অর্পিত দায়িত্ব পালন শিরোধার্য ভেবে আমি

অনুবাদের পথে অগ্রসর হই। ফলে জন্ম নেয় আজকের এই "আকাবিরদের জিহাদী জীবন" বইটি।

রচনা অপেক্ষা অনুবাদ করা অনেকটাই দুরূহ। তবুও চেষ্টা করেছি মূল বিষয়টা পরিমার্জিত আকারে ও প্রাঞ্জল ভাষায় রূপান্তর করার। যেহেতু মূল বইটির উর্দূ অত্যন্ত উঁচুমানের এবং উপস্থাপনা বক্তৃতাসুলভ, তাই আমি হুবহু অনুবাদ না করে অনুসরণ করেছি মাত্র। এক্ষেত্রে আমি কতটুকু সফল তা পাঠকের বিচার্য।

বইটি পাঠ করে যদি একজনও আকাবিরদের
সেই জিহাদী প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হন তাহলে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু স্বার্থক মনে করব।

বিনীত

মুহাম্মাদ
ইমামুদ্দীন শরীফ

সম্পাদকের কথা

نحمده و نصلي على رسوله الكريم

একজন মানুষের জন্য তার পিতৃ পরিচয় যেমন আবশ্যক একজন মুসলমানের জন্য তেমনি আবশ্যক তার পূর্বসূরী আকাবির ও বুযুর্গানে দ্বীনের পরিচয় সম্পর্কে অবগতি। প্রয়োজন তাদের নীতি আদর্শ ও কর্ম পদ্ধতির ব্যাপারে সম্যক জ্ঞান অর্জন ও তাঁদের আলোকিত জীবনের অসাধারণ কৃতি -অবদান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সেমতে জীবন গঠনে সচেষ্ট থাকা।

আমাদের পূর্বসূরী আকাবিরদের জীবন বিভিন্ন প্রজ্ঞা ও নৈপূন্যতায় এতটাই সমৃদ্ধ যে, মানব জীবন বিশেষতঃ ইসলামী জীবনের এমন কোন দিক নেই, যেখানে তাদের পক্ষ থেকে সঠিক দিক নির্দেশনা দেয়া হয়নি। সেমতে আমাদের আকাবিরগণের সমন্বিত জীবনকে আমরা আমাদের জীবনার্দশ হিসেবে গ্রহণ করতে পারলে তা আমাদের জন্য হবে বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়।

ঈমান ও আকীদা, সাধনা ও মুজাহাদা, রুহানিয়্যত ও আধ্যাত্মিকতা, লেন-দেন ও সামাজিকতা, জিহাদ ও সংগ্রাম, ইসলাহ ও ইনকিলাবে, বাতিল প্রতিরোধ ও হক প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সহ সর্ব ক্ষেত্রেই তাঁরা ছিলেন আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। আর তাই তাদের জীবন ও কর্ম আমাদের আলোচনা করা প্রয়োজন নিজেদের স্বার্থেই।

উর্দূ আরবী ভাষায় এ বিষয়ে কিছু বই পত্র পাওয়া গেলেও বাংলাভাষায় এ জাতীয় গ্রন্থের অপ্রতুলতা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। বিশেষতঃ আকাবিরদের জিহাদী জীবন সম্পর্কে এ ধারায় কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ আছে বলে আমার জানা নেই।

এক্ষেত্রে ইসলামের সাহসী সন্তান সিংহ পুরুষ ও মর্দে মুজাহিদ খতীবে ইসলাম শহীদ মাওলানা জিয়াউর রহমান ফারুকী (রহঃ) - এর উর্দূ ভাষায় লিখা "ইউরোপ কে সংগিন

মুজরেম" নামক কিতাবটি যথেষ্ঠ তথ্য সমৃদ্ধ।

উপরোক্ত বইটিকে অবলম্বন করেই মাওলানা ইমামুদ্দীন শরীফ বক্ষমান গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটি তৈরি করেছে, আমি তার পাণ্ডুলিপিটি আগা গোড়া পড়েছি। এতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শব্দ প্রয়োগের অসানঞ্জস্যতা ও তথ্যগত যে সব বিচ্যুতি আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে তা সংশোধন করে দিয়েছি এবং ভাষা ও সাহিত্যের দিকটি যথা সম্ভব মার্জিত করার চেষ্টা করেছি। এ ক্ষেত্রে তার চেষ্টা-প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে তিনি একজন দক্ষ কলম সৈনিকের ভূমিকা পালন করতে পারবেন বলে মনে করি।

প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল আশরাফের স্বত্বাধীকারী বিশিষ্ট আলেমেদ্বীন জনাব মুফতী মাওলানা হাবীবুর রহমান খানের আন্তরিকতা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার, জাতির অভাব পূরনে তার সাহসী ভূমিকায় আমরা মুগ্ধ।

সম্মানিত পাঠকবর্গ গ্রন্থটি গুরুত্ব সহকারে পাঠ করলে বিভিন্ন দিক থেকে উপকৃত হবেন সন্দেহ নেই। সাথে সাথে

একটি অচেতন মুসলিমগোষ্টিকে নব চেতনায় উজ্জিবিত করতেও সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

গ্রন্থটি নির্ভুল ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার চেষ্টায় আমরা ক্রুটি করিনি। এরপরও ক্রুটি -বিচ্যুতি থেকে যাওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক। তাই কোথাও কোন অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধনের ব্যাপারে আমরা সম্মানিত পাঠকবর্গের সহায়তা কামনা করি।

পরিশেষে গ্রন্থটি পাঠ করে পাঠকবর্গ উপকৃত হোন, তাদের মাঝে নব চৈতন্যের উম্মেষ ঘটুক এবং মহান আল্লাহ এর লেখক , সম্পাদক ও প্রকাশকসহ সকলকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন, একামনা করছি। আমীন!

বিনয়াবনত

মুশতাক আহমাদ শরীয়তপুরী

উস্তাদ , জামিয়া ইসলামিয়া আরবিয়া

তাঁতীবাজার , ইসলামপুর , ঢাকা -১১০০

প্রকাশকের কথা

بسم الله الرحمٰن الرحيم

শৈশব থেকেই বই -পত্র ও লাইব্রেরীর প্রতি আমার দুর্বলতা ছিল। প্রবাসেও সে

দুর্বলতা কমেনি বরং নতুন নতুন ঝকঝকে ছাপা ও মজবুত বাঁধাইয়ের কিতাবগুলো দেখলে এবং কোন বড় লাইব্রেরীর কথা শুনলে যতক্ষণ সেই কিতাব খুলে না দেখতাম এবং লাইব্রেরীতে কিছু সময় না কাটাতাম ততক্ষণ স্বস্তি পেতাম না। এ আকর্ষণেই একদিন করাচী এয়ারপোর্ট সংলগ্ন বিশাল মসজিদের লাইব্রেরীতে উপস্থিত হয়ে কিছু সময় কাটাই। সে সময় ছোট কিছু রেসালা (পুস্তিকা)-এর আলমারীতে বক্ষমান **یـورپ ک[illegible] سـنگین مجـرم** (আকাবিরদের জিহাদী জীবন) কিতাবটিও পেয়ে যাই এবং তা পড়তে শুরু করি। সময়ের স্বল্পতা ও লাইব্রেরী বন্ধ হওয়ার কথা ভুলে পড়তে ও বিস্মিত হতে থাকি। কিন্তু লাইব্রেরী বন্ধ করার সময় হওয়ায় বইটি শেষ করার আগেই আমাকে চলে আসতে হয়। পরবর্তিতে বিভিন্ন কুতুবখানায় খুঁজে বইটি পেতে ব্যর্থ হই। কয়েকদিন পরে এক বিকেলে একজন হকার বিভিন্ন প্রকার ছোট ছোট রিসালা নিয়ে এসে আমাদের দারুল ইকামা 'মাহমুদ মঞ্জিল' -এর সামনে দোকান লাগায়। আমি তার রিসালাসমূহের মধ্যে আমার কাংখিত এই রিসালাটিও পেয়ে যাই এবং তা লুফে নিই।

খতীবে ইসলাম শহীদ মাওলানা জিয়াউর রহমান ফারুকী (রহঃ) –এর নাম দেশে থাকা অবস্থায়ই শুনেছি। পাকিস্তানে পড়ার সময় সরাসরি তাঁর অগ্নিঝরা ভাষণ এবং বাতিলের প্রতি তাঁর নির্ভীক চ্যালেঞ্জ পেশ করার

উপভোগ্য দৃশ্য আবলোকন করার সুযোগ বার বার হয়েছে। ফলে তাঁর বয়ান ও রচনার প্রতি আমি খুবই আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। তাছাড়া এ বইটির আলোচ্য বিষয়ও এমন যে আমার মত আকাবির পাগলের জন্য হৃদয়ের গভীরে ভরে রাখার মত মহামূল্যবান বস্তু বৈ নয়।

বইটি আমি বার বার পড়েছি আর নিজের অযোগ্যতার জন্য অনুবাদ করতে না পারার আফসোস করেছি।

গতবছরের মাঝামাঝি সময়ে আমার স্নেহাস্পদ মাওলানা ইমামুদ্দীন এসে কিছু লেখার আগ্রহ প্রকাশ করলে আমি এটি তার হাতে তুলে দেই এবং সাথে সাথে বলি যে অনুবাদ সম্ভব না হলেও অনুকরণ কর। যাইহোক সে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে দেয়। পরবর্তিতে স্বনামধন্য লেখক ও আলেম মাওলানা মুশতাক আহমাদ শরীয়তপুরী ছাহেবের দক্ষ সম্পাদনায় বইটি যথেষ্ঠ প্রাঞ্জল ও সাবলীল হয়েছে। আল্লাহপাক তাঁকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন

বর্তমান প্রজন্ম অনেকটা ইতিহাস
বিমুখ, তাছাড়া আমাদের স্কুল-কলেজে যে সকল বিকৃত ইতিহাস পড়ানো হয়, সেগুলো পড়ার চেয়ে না পড়াই ভাল। সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা বর্তমান নোংরা দলীয় রাজনীতির শিকার সিলেবাসভুক্ত ইতিহাসের। যা পাঠ করলে সময়ের অপচয় ছাড়া কিছুই হবে না। তাই মুসলিম

নব প্রজন্মকে ইসলামী ঐতিহ্য ও ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক অবগতি দানের মহান ব্রত নিয়ে মাকতবাতুল আশরাফ একটি সুদূর প্রসারী পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। "আকাবিরদের জিহাদী জীবন" সে উদ্যোগেরই ফসল।

আমরা বইটিকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কোন সহৃদয় পাঠকের চোখে কোন ত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে আমাদের অবগত করলে পরবর্তি সংস্করণে তা শুধরে নিবো- ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে আকাবিরদের জিহাদী জীবনের পদাঙ্ক অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন। ইয়া রব্বাল আলামীন।

বিনয়াবনত

তারিখ
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

১৬ ই জুমাদাল আখিরাহ
জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া তাঁতীবাজার, ঢাকা

সূচীপত্র
শাহ্ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ)...............................25 শাহ্ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ)...............................36 ফতহে আলী টিপু সুলতান (রহঃ)........41 হযরত সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ (রহঃ) 49 হযরত শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)......56 মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতভী (রহঃ)..61 হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহঃ)..69 হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী (রহঃ)............................75 হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী (রহঃ)..84 সাইয়্যেদ মুহাম্মদ দাঊদ গজ্নভী (রহঃ)..89 হযরত মাওলানা মুফ্তী কেফায়েতুল্লাহ (রহঃ)..................93

সাইয়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ)..99

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (রহঃ) 106

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জাওহার (রহঃ)..112

হযরত মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী (রহঃ)..116

সাইয়্যেদ আতাউল্লাহ শাহ্ বুখরী (রহঃ)..121

কৈফিয়ত

পাক, ভারত, বাংলা উপমহাদেশের আযাদী আন্দোলনের অন্যতম প্রাণ পুরুষ, যাকে আমীরুল মুমিনীন নির্ধারণ করে। আযাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিল সেই সিংহ পুরুষ, সাইয়েদুত্ তায়েফাহ হযরত মাওলানা হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহঃ) -এর জিহাদী জীবনের আলোচনা সঙ্গত কারণেই এ বইয়ের অংশ হওয়া অপরিহার্য ছিল। কিন্তু আমাদের মূল অবলম্বন 'ইউরোপ কে সংগীন

মুজরেম' নামক কিতাবে হযরত হাজী ছাহেব (রহঃ) –এর আলোচনা নেই, তাই আমরাও আমাদের বইয়ের বর্তমান সংস্করণে তা অন্তর্ভুক্ত করতে সামর্থ হয়নি। পরবর্তী সংস্করণে ইংশাআল্লাহ্ হযরত হাজী ছাহেব (রহঃ) –এর জিহাদী জীবনের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করার দৃঢ় ইচ্ছা আমাদের আছে।

আরেকটি বিষয় হলো, মূল অবলম্বনে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিতর্কিত কয়েকজন ইংরেজ বিরোধী ব্যক্তির আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আমরা যেহেতু এই বইয়ে শুধু আমাদের আকাবিরদেরকেই উপস্থাপন করতে চেয়েছি তাই ধর্মীয় দিক দিয়ে বিতর্কিত ব্যক্তিদের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

- প্রকাশক

হে আদম সন্তানেরা! তোমরা আল্লাহর পথ পরিহার করেছ। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সুন্নত ছেড়ে দিয়েছ। তোমরা একে অপরের অধিকার ক্ষুণ্ন করছ। তোমরা বনী আদমের অধিকার লংঘনের অপরাধে অপরাধী। তোমরা ভাইয়ে ভাইয়ে কাটাকাটি হানাহানি করছ। পরস্পরে যুদ্ধ বিগ্রহ করছ। আজ তোমাদের দুশমনরা সশস্ত্র অবস্থায় তোমাদের ধ্বংস সাধনের পথ খুঁজছে। তোমরা বিলাসী জিন্দেগী ত্যাগ কর। সীমা লংঘনের পথ ছেড়ে দাও। এক আল্লাহর নির্দেশ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চল। দেখবে, অচিরেই বিজয় তোমাদের পদচুম্বন করবে।

- মুসলিম জনসাধারণের প্রতি

শাহ্ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) -এর নসীহত

ইংরেজ বেনিয়াদের হীন চক্রান্তের সূচনা

ও

হাকীমুল হিন্দ হযরত মাওলানা

শাহ্ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) জন্ম: ১৭০৩ ঈসায়ী - মৃত্যু: ১৭৬২ ঈসায়ী

আজ থেকে ২৭০ বৎসর আগের কথা। তখন দিল্লীর ভাগ্যাকাশে দেখা দিয়েছিল কালো মেঘের ঘনঘটা। জাতির ঘাড়ে চেপে বসেছিল দুর্দশা, দুর্গতি ও দুর্যোগের ভয়াল মূর্তি। রাজধানীর শান্ত পরিবেশ পর্যবসিত হয়েছিল রণাঙ্গনে। একে একে শহরগুলো উজাড় হয়ে যাচ্ছিল। বসতিগুলো হয়ে পড়ছিল জরাজীর্ণ। লুটতরাজ, অরাজকতা ও স্বৈরাচারিতার করাল স্রোত নগরবাসীকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল এক অজানা গন্তব্যের পথে। গ্রাম – গঞ্জের রাস্তা-ঘাট নির্যাতিত মজলুম বনী আদমের রক্তে রঞ্জিত

হচ্ছিল। নিপীড়িত মানবতার রক্তস্রোতে পিচ্ছিল হচ্ছিল দিল্লীর পিচ ঢালা সড়কগুলো। শত্রু পক্ষ মুসলমানদের নিঃশেষ করার জন্য সদা আঁটছিল নানা ফন্দি। ইতিহাসের এমনই এক ক্রান্তি লগ্নে - যখন নিরীহ মুসলিম জনগোষ্ঠী একে অপরের কাছে আশ্রয় খুঁজে ফিরছিলো ঠিক তখন পিশাচগোষ্ঠী বসে বসে মুসলমানদের এই দুর্দশা সানন্দে উপভোগ করছিল।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়েছিল মাত্র কিছুকাল আগে। তাঁর মৃত্যুর পর এত দ্রুত কেন এই পরিবর্তন জাতি বুঝে উঠতে পারছিল না। তখন ইসলামী রাজ্যগুলো বিদ্রোহে ফেটে পড়েছিল। তখন কেউই সে সময়ে বাদশাহ সুলতান শাহের রাজ ফরমান তামিল করছিল না। মানছিল না প্রশাসনিক আইন-কানূন। তখন চতুর্দিক অন্ধকারে ছেয়ে গিয়েছিল। চারদিকে বিরাজ করছিল মহা প্রলয়ের ভয়াল দৃশ্য। দৃশ্যপটে আসছিল কিয়ামত দিবসের এক সচিত্র প্রতিবিম্ব। এমনই এক যুগ সন্ধিক্ষণে সম্ভ্রান্ত পরিবারে উঁকি দিল হিদায়েতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। রাজধানী দিল্লীর খ্যাতিমান ও স্বনামধন্য আলেম শায়েখ আব্দুর রহীমের গৃহে উদ্ভাসিত হল সেই প্রদীপ্ত সূর্য। অল্প দিনের মধ্যেই এর আলোর বিচ্ছুরণ সারা দেশে ছড়াতে লাগল। যে পবিত্র দেহে হিদায়াতের এই প্রদীপ জ্বলছে;

তিনি অন্য কেউ নন। তিনি হলেন হযরত মাওলানা শাহ্ ওলীউল্লাহ।

এখনো বিদ্রোহের তুফান চলছে। পরিবেশ
ও পরিস্থিতি এখনো প্রতিকূল। প্রথম বাহাদুর শাহ্, জাহানদার শাহ্, ফররুখ সিয়ার, রফীউদ্ দারাজাত শাহ্, আহমাদ শাহ্, রফিউদ্দৌলা, দ্বিতীয় আলমগীর, দ্বিতীয় শাহ্ আলম প্রমুখের রাজত্ব বৈদ্যুতিক স্তম্ভের ন্যায় অতিবাহিত হচ্ছে। মারাঠাদের বিদ্রোহের সফলতা হাতের মুঠোয়। নাদের শাহ্ -এর আক্রমণ নিষ্ফল হয়নি। রাহিলাদের অনুপ্রবেশ কোন অংশেই কম ধ্বংসাত্মক নয়। তুরানী শাসকদের অনৈক্য মারাত্মক ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে ইউরোপীয় গোষ্ঠীর লোলুপ দৃষ্টি এবং বীর বাঙ্গালীদের মধ্য হতে কয়েকজন দালালকে এবং তাদের মাধ্যমে ইংরেজদের স্বার্থ হাসিল করা কম দুঃখজনক ব্যাপার ছিল না । সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় এসব ভাঙ্গা- গড়া শাহ্ ওলীউল্লাহ (রহঃ) স্বচক্ষে দেখলেন। শুধু দেখলেন তাই নয় বরং গভীরভাবে তিনি বিষয়টি নিয়ে ভাবলেন। তখন তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন যে, এই সমাজের আমূল পরিবর্তন করতে হবে। ঢেলে সাজাতে হবে এই বিধ্বস্ত সমাজকে। পথহারা জাতিকে দিতে হবে ফিকির এবং আমলের সমন্বয় সাধনের দিশা। জানাতে হবে জাতি এবং দেশের পুনর্গঠন

পদ্ধতি, সর্বোপরি মুসলমানদেরকে উদ্বেলিত করতে হবে স্বাধীনতার পয়গামে।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক শাহ্ ওলীউল্লাহ (রহঃ) পরিকল্পনা ও কর্মসূচী তৈরী করলেন। কিন্তু পরিকল্পনাকে বাস্তবতার চেহারা দেখাতে হলে প্রথমে যে তাঁকেই এগিয়ে আসতে হবে। তাঁকে হতে হবে অন্যায়ের প্রতিরোধে (প্রতিকারে) অগ্রসৈনিক। স্বীকার করতে হবে তাঁকে সর্বোচ্চ ত্যাগ ও পেশ করতে হবে সর্ব বৃহৎ কুরবানী। তখন তারকার ভেল্কিবাজি এবং গনক ও জ্যোতিষীদের কারসাজী সর্বত্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) তাঁর কর্মসূচীতে প্রথম হিদায়াতের আওয়াজ বুলন্দ করলেন। তখন মুসলমানদের বিভিন্ন শ্রেণী উল্লেখ করে তিনি যে পয়গাম পাঠিয়ে ছিলেন তা হল -

হে রাজা বাদশাহগণ! বিভিন্ন যুগে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের বিশেষ কিছু সুযোগ থাকে। আর এ যুগে আল্লাহপাকের সান্নিধ্যার্জনের সর্বোত্তম পন্থা হল আপনারা তলোয়ার উত্তোলন করুন। এবং ততক্ষণ পর্যন্ত তলোয়ার কোষবদ্ধ করবেন না যতক্ষণ না মুসলমানগণ শিরক থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয় এবং কাফের এবং ফাসেক সম্প্রদায়ের অহংকারী নেতৃত্ব দুর্বল হয়ে না যায়।

হে নেতৃবর্গ! আপনারা সততা ও ন্যায় বিচারকে দৃঢ় হস্তে ধারণ করুন। আপনারা এমন উজির ও সভাষদ নিয়োগ করুন যারা অত্যাচারীদের কবল থেকে মজলুমদের অধিকার আদায় করতে সক্ষম। আপনারা দলে এমন লোক ভর্তি করুন যারা আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে কারো ভর্ৎসনা ও কান-কথার তোয়াক্কা করে না এবং কুফরের বক্ষে ছুরিকাঘাত করতে যারা সংশয়ী হবে না।

হে নশ্বর পৃথিবীর বিচারকমন্ডলী! আপনারা এমন মামলাগুলো বাতিল করে দিন যেগুলো বিশ্বচরাচরের স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনের সাথে সাংঘর্ষিক। আপনার আজই নিজেদের রীতি-নীতি, পদ্ধতি-প্রণালী সাজিয়ে নিন। জেনে রাখুন! একমাত্র এ পন্থাই হলো সফলতা অর্জনের সবচেয়ে বড় রাজপথ।

আমীর এবং দেশের কর্ণধারদের প্রতি

শাহ্ ওলীউল্লাহ (রহঃ) -এর আহ্বান

হে আমীরগণ! আপনারা দুনিয়ার সর্বোচ্চ ভোগ বিলাসে আকন্ঠ নিমজ্জিত। আপনারা কি প্রকাশ্যে মদ পান করেন না? এরপর কি আবার এতে উল্লসিতও হন না?

আমার ইশতেহার: আমার নয়, বরং এটা আল্লাহ'রই ইশতিহার! আপনারা ব্যভিচার পরিহার করে পুণ্যবানদের দলে আশ্রয় নিন। মদের গ্লাস ছুঁড়ে ফেলে কর্দমাক্ততা থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসুন। ধ্বংস খুবই আসন্ন। যদি আপনারা নিজেদের নীতির পরিবর্তন না করেন তাহলে দেখবেন আপনাদের আনন্দ-উল্লাস এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অনুষ্ঠানগুলো অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হবে। আপনারা লাবণ্যময়ী প্রেয়সী ও কান্তিময় তুলতুলে রমণীদের নিয়ে, মহা হর্ষোৎফুল্লে লিপ্ত আর জীবনের মহান লক্ষ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর। আকাশচুম্বী বালাখানা এবং সুরম্য অট্টালিকা ব্যতীত অন্য কোন দিকে আপনাদের দৃষ্টি পড়ে না। আসুন! এসব ছেড়ে দিয়ে যুগ ও জীবনের গতি পরিবর্তনে সচেষ্ট হোন। মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে নিন। ঐক্যের পতাকা নিয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুন। অন্যথায় অপমান, লাঞ্ছনা এবং অপদস্ততার কৃষ্ণতা থেকে আপনাদের আঁচল কোনভাবেই রক্ষা পাবে না।

সৈনিকদের প্রতি শাহ্ ওলীউল্লাহ্ (রহঃ) -এর আহ্বান

সৈনিকদেরকে সম্বোধন করে শাহ্ ওলীউল্লাহ্ (রহঃ) বলেন, আপনারা জাতির পথ

প্রদর্শক। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপনাদেরকে জিহাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। যাতে আপনারা আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করেন। অথচ আজ আপনারা অস্ত্র জোগাড় করেছেন পরস্পরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে। আপনারা যুদ্ধে চরম ত্যাগ স্বীকার করেছেন বটে, কিন্তু সে ত্যাগ অর্থবহ হচ্ছে না। কারণ রণক্ষেত্রে আপনারা নিজেরাই নিজেদের রক্ত ঝরান। আপনারা মদ পান করেন। নেশার উন্মাদনায় নিজেদের শৌর্য-বীর্য নিস্তেজ করে ফেলেন। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি; আপনারা অচিরেই আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবেন। সেখানে পুরো জীবনের ফলাফল পেয়ে যাবেন। দেখুন, এখনো সময় আছে। সতর্ক হোন। অতীতের সকল কাজগুলো পাল্টিয়ে নিন। কুফরীর ধোঁকা পরিহার করুন। নিজেদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলুন। তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। সলাতের প্রতি যত্নবান হোন। সর্বোপরি এমনভাবে জীবন পরিচালনা করুন, যাতে আপনাদের কোন কথা-কাজ ইসলামী ধ্যাণ-ধারণা বা নীতির পরিপন্থী না হয়।

পীর মাশায়েখদের প্রতি

হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ্ (রহঃ) -এর পত্র

তিনি পীর মাশায়েখদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন যারা নিজেদের পিতৃ-পুরুষদের কৃষ্টি-কালচার পরিহার করে অন্যের সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি ঝুঁকে পড়ে, তাদের কি অবস্থা হবে? আর এতে বাধা না দেয়ায় আপনাদেরই বা কি পরিণতি হবে? বিভিন্ন দল-উপদলে আপনাদের বিভক্তি গোটা মুসলিম জাতির বিভক্তির শামিল। আপনারা নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করুন। পার্থিব ধন-সম্পদের প্রাচুর্যতার স্তুপ থেকে বেরিয়ে আসুন। খানকার পবিত্রতা, সম্মান ও যথার্থতা, শুধু নিরাপদ জীবনের মধ্যে সীমিত নয় বরং জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহও এক ব্যাপক বিপ্লবের পথ নির্মাণ করতে হবে আপনাদেরকে।

বিভিন্ন পেশাজীবিদেরকে লক্ষ্য করে

হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ্ (রহঃ) -এর আহ্বান

হে পেশাজীবি ভায়েরা! দেখুন, অন্যের আমানত তার প্রাপকের নিকট পৌঁছে দেয়ার

জযবা আপনাদের থেকে হারিয়ে গেছে। আল্লাহর ইবাদত থেকে আপনারা সম্পূর্ণ উদাসীন। আপনারা নিজেদের তৈরী উপাস্যের নামে বিভিন্ন জিনিস উৎসর্গ করে থাকেন। আপনাদের মাঝে একটি শ্রেণী হতদরিদ্র। তারা দারিদ্র ও নিঃস্বতার কষাঘাতে আল্লাহকে ছেড়ে দিয়েছে। আরেকটি শ্রেণী অত্যন্ত ধনবান। তারা বিত্ত-বৈভব ও ধনৈশ্বর্যের নেশায় স্রষ্টাকে পর্যন্ত ভুলে গেছে। জেনে রাখুন, আপনাদের ভ্রান্ত কর্ম-কৌশল ও পদ্ধতি কুফরীর বিস্তৃতির পথকে সুগম করে দিচ্ছে। ব্যবসায় আপনাদের অনভিজ্ঞতা, অপরিপক্কতা ও অদূরদর্শিতা কাফির মুশরিকদেরকে আপনাদের অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের মালিক বানিয়ে দিচ্ছে। ভেবে দেখুন! আজ আপনারা কোথায় আছেন। আর প্রকৃতপক্ষে কোন পথে আপনাদের চলা উচিৎ। সুতরাং আসুন! আজ থেকেই দাওয়াতী ফিকির এবং ইসলামের প্রচারকার্যকে নিজেদের একান্ত ও গুরুত্বপূর্ণ ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে নিন। আল্লাহর শেখানো সভ্যতা-সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-কালচারকে গ্রহণ করুন। রাজাধিরাজের শাশ্বত বিধান সর্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করুন। গোটা বিশ্বের সকল তন্ত্র-মন্ত্র বাদ দিয়ে এক আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার বিপ্লবে সর্বোতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। অন্যথায় লাঞ্ছনার জিঞ্জির যখন গলায় এসে পড়বে তখন ইতিহাসের পাতায় আপনাদের ব্যাপারে শুধু ব্যঙ্গোক্তি, ভর্ৎসনা ও

কটাক্ষ ছাড়া আর কিছুই লেখা হবে না। হুশিয়ার! হুশিয়ার!! কষ্মিন-কালেও কুফরির পাতা ফাঁদে পা দেবেন না। তারা পথের বাঁকে বাঁকে ওঁৎ পেতে বসে আছে আপনাদেরকে বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যচ্যুত করতে।

ভ্রান্ত পথের পথিক আলেমদের উদ্দেশ্যে

শাহ্ ওলীউল্লাহ্ (রহঃ) -এর ভাষণ

ভ্রান্ত পথের অনুসারী আলেমদেরকে লক্ষ্য করে হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) বলেন, হে বোকার দল! তোমরা নিজেদের নাম রেখেছ আলেম। অথচ তোমরা ইউরোপের দাসত্বে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। ভাবখান তোমাদের এমন যেন, ইউনানের দর্শন আর কিছু নাহু-ছরফ পড়ে তোমরা আত্মতৃপ্তি নিয়ে বসে আছ যে, এটাই বুঝি পূর্ণাঙ্গ ইলম। স্মরণ রেখো, ইলম শুধু কুরআনের অকাট্য আয়াত, আর বিশুদ্ধ হাদীসের নাম। তাই কুরআন শিখ। কুরআনের সার্বিক নির্দেশনা যথাযথভাবে বুঝে তা পালনে ব্রতী হও। ওয়াজিবগুলো আদায় কর। অতঃপর জিহাদী চেতনা নিয়ে সম্মুখপানে এগিয়ে চল। তোমরা কি দেখছ না! আজ গোটা জাতি ভ্রষ্টতার অতল সমুদ্রে

ডুবে যাচ্ছে। ব্যবসার ছদ্মবেশে আসা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আজ চরম অত্যাচারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আর তোমরা মসজিদ-মিম্বরের পবিত্রতা বিক্রি করে খাচ্ছ। সজাগ হও। সময় এসেছে। বাগদাদের করুণ ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। এই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তোমাদেরই অদূরদর্শিতা ও অন্ধত্বের সুযোগে নিজেদের শিকড় মজবুত করে নিয়েছে। আজ পৃথিবীর সকল তাগুতী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমাদেরকে নিঃশেষ করে চলেছে। আর তোমরা দরোজা বন্ধ করে বসে আছ। তারা তোমাদের আল্লাহ এবং রাসূলকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। কিন্তু তোমাদের এমন শক্তি-সামর্থ ও শৌর্য-বীর্য নেই যাতে তাদের দেহ-মন জুড়ে কম্পন সৃষ্টি করতে পারো। পরিশেষে বলছি, তোমরা প্রতিটি ক্রিয়া-কর্মে, ওঠা-বসায় সুন্নাতের যথার্থ অনুসরণের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে শিখ এবং মানবতার স্বার্থে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ো।

দ্বীনের মাঝে সংকীর্ণতা সৃষ্টিকারী ওয়ায়েজ

দরবেশদের প্রতি হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ্ (রহঃ) -এর চিঠি

ইসলামের বিস্তৃতিকে সংকীর্ণ ও খণ্ডিতভাবে যারা উপস্থাপন করে সে সব ওয়ায়েজ ও আবেদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা, কেন আপনারা জাল ও বানানো হাদীস দ্বারা আল্লাহর বান্দাদের জীবন দুর্বিষহ ও সংকীর্ণ করে তুলেছেন? অথচ আল্লাহ তো আপনাদেরকে এ জন্য সৃষ্টি করেছেন যে, আপনারা মানুষের জীবনকে সহজ করে তুলবেন। অনুগ্রহ ও দয়াদ্রতার পথ অনুসরণ করুন। সাহাবাদের (রাযিঃ) জীবনকে নিজেদের জীবনের অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করুন। দুশমন ও শত্রুদের চক্রান্ত নস্যাৎ করতে সচেষ্ট থাকা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর একটি সার্বক্ষণিক সুন্নাত। অথচ আপনারা এ জাতীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতের প্রতি মোটেও ভ্রুক্ষেপ করছেন না। বিশ্বাস করুন, এক দিন অবশ্যই আপনাদেরকে সমস্ত কৃত কর্মের হিসাব দিতে হবে। আর সে দিন বেশী দূরে নয়।

মুসলিম জনসাধারণের প্রতি

হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ্ (রহঃ) -এর আহ্বান

হে আদম সন্তানেরা! তোমরা আল্লাহর পথ পরিহার করেছ। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সুন্নত ছেড়ে দিয়েছ। তোমরা একে অপরের অধিকার ক্ষুণ্ন করছ। তোমরা বনী আদমের অধিকার লংঘনের অপরাধে অপরাধী। তোমরা ভাইয়ে ভাইয়ে কাটাকাটি হানাহানি করছ। পরস্পরে যুদ্ধ বিগ্রহ করছ। আজ তোমাদের দুশমনরা সশস্ত্র অবস্থায় তোমাদের ধ্বংস সাধনের পথ খুঁজছে। তোমরা বিলাসী জিন্দেগী ত্যাগ কর। সীমা লংঘনের পথ ছেড়ে দাও। এক আল্লাহর নির্দেশ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চল। দেখবে, অচিরেই বিজয় তোমাদের পদচুম্বন করবে।

হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) গোটা জাতির প্রতি এ গভীর চিন্তা, দরদ ও আবেগ জড়িত ভাষায় এক সংস্কার আন্দোলনের ডাক দিয়ে চললেন। গোটা হিন্দুস্তানবাসীর সামনে পেশ করলেন সর্ব শ্রেণীর মানুষের প্রতি সৌহাদ্য, ভ্রাতৃত্ব এবং ঐক্যের এক কার্যকরী মিশন। এভাবে কিছুদিন অতিক্রান্ত হল। এরপর জাট সম্প্রদায় প্রকাশ্যে যুদ্ধে নেমে এল। তখন মুসলমানদের নেতৃত্ব দেয়ার মত কেউ ছিল না। এরই পেক্ষাপটে হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) তৎকালীন সর্দার জনাব নজীবুদ্দৌলার কাছেও এ মর্মে চিঠি লিখলেন। সে চিঠি তার মর্মে স্পর্শ করল।

ওদিকে তুমুল যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কয়েকজন মুসলিম সর্দার ও জাট সম্প্রদায়কে সাহায্যের ঘোষণা দিয়ে বসলেন। যে মুসলিম সম্প্রদায় কোন শক্তির নিকট পরাজয় বরণ করেনি তারা নিজ সম্প্রদায়ের নিকটই পরাজিত হল। মারাঠা সম্প্রদায় এ পরিস্থিতি নিরবে প্রত্যক্ষ করল এবং তারা জাট সম্প্রদায়ের সাহায্যে এগিয়ে এল। তখনকার পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত বিভীষিকাময়। তখন মুসলিম সম্প্রদায়ের নৌকা কুফরীর উত্তাল সাগরের ভয়াল মোহনায় বেহাল অবস্থায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। ইতিহাসের এমনই এক পরিস্তিতিতে হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ)ই একমাত্র ব্যক্তি; যিনি তখন আহমদ শাহ্ আবদালীর (রহঃ) কাছে অস্ত্র এবং সৈন্য সাহায্য চাইলেন।

কিছুদিন পর আফগানিস্তানের এই ওলী হিন্দুস্তান এলেন। এখানে তিনি গোটা দেশে অগ্নিঝরা পরিস্তিতি অবলোকন করেন। মুসলমানদের এই করুণ দৃশ্য তাকে অভিভূত করে। তিনি তাড়িত হন এক অদৃশ্য তাড়নায়। বিলম্ব না করে তিনি তাঁর সৈন্য বাহিনীকে নির্দেশ দেন মুসলমানদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে। আর এরই সূত্র ধরে সংঘটিত হয় পানি পথের যুদ্ধ। এতে মারাঠাদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ্ (রহঃ) –এর আপ্রাণ চেষ্টায় হিন্দুস্তানের মাটিতে বিজয়ের পথ সুগম হয়।

এটা ছিল বিজয়ের এমন ফসল যে, এ উপমহাদেশে হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠার যে আশঙ্কা ছিল তা চিরতরে খতম হয়ে যায়। কারণ অর্থনৈতিক ভাবে দেশ দেউলিয়া হয়ে গেছে বহু আগেই । হিন্দু জমিদারদের নির্যাতন মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে বেশ পূর্বেই। শ্রমিক মজুররা গগন বিদারী আর্তনাদ করছে জঠর জ্বালায়। ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত মানবতার নিঃশব্দ কান্নায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে গোটা এলাকা। কুলি-মজুর ও মেহনতী মানুষের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। এমনই এক পরিস্থিতিতে হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) ঘোষণা করলেন ইসলামের বৈপ্লবিক অর্থব্যবস্থা। যে ব্যবস্থায় গোটা বিশ্বের অর্থব্যবস্থা এবং নীতিমালার প্রতি তার দৃষ্টান্ত স্থাপনের এবং তার সাথে মুকাবেলা করার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে। এরপর রাষ্ট্রীয় অস্থিতিশীলতার অবসান কল্পে তিনি কলমযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। তিনি তৎকালীন বাদশাহর কাছে দ্বিতীয়বারের মত এ মর্মে চিঠি লিখলেন যে, তিনি যেন বঞ্চিতদেরকে তাদের পাওনা ফিরিয়ে দেন। কায়েম করেন জনগণের ন্যায্য অধিকার। তিনি যেন জাতিকে নতুন নতুন ট্যাক্স এবং আজব যত আইন কানুনের যন্ত্রণা থেকে রেহাই দেন। অন্যথায় এদেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে যুদ্ধের দাবানল এভাবে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে যে,

এতে রাজপ্রাসাদও জ্বলে-পুড়ে ভষ্ম হয়ে যাবে।

উপমহাদেশে একমাত্র হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ্ (রহঃ)-ই এই প্রশংসার যোগ্য যে, তাঁর মাধ্যমেই এদেশে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হাদীসের সুবিশাল ভাণ্ডার জাতির কাছে এসে পৌঁছেছে। তিনিই সর্ব প্রথম বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কলমযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তিনি হিন্দুস্তানের জনগণকে আসন্ন সর্ব প্রকার বিপদাপদ সম্পর্কে সচেতন করেন। পরিশেষে এমন এক সময় আসে যখন সে সময়ের হুকুমত তার প্রতি মারাত্মক অত্যাচার শুরু করে। কিন্তু তখন এমন কোন শক্তির অস্তিত্ব ছিল না যে তাঁর জ্বালাময়ী ভাষণ এবং ক্ষুরধার লিখনির সর্বব্যাপী মিশনের অগ্রযাত্রা রোধ করতে পারে।

ইলমী জগতে শাহ্ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) এমন এক উন্নতি ও সমৃদ্ধির উৎস ছিলেন যে, তিনি আল্লাহ প্রদত্ত মেধা, প্রতিভা ও স্মৃতি শক্তির মাধ্যমে সে সময়ের প্রয়োজনীয় লক্ষ লক্ষ জটিল-কঠিন মাসআলার কুরআন ও হাদীসের আলোকে সমাধান করেছেন। তিনি ঈমান-আমল, ইসলাহ ও রাজনীতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ৮৪টি

গ্রন্থ রচনা করেন। যার আলোকরশ্মিতে আজো পাক-ভারতের অলি-গলি আলোকিত হচ্ছে।

এখন থেকে এদেশের মুসলমানরা 'দারুল হরব' তথা শত্রু কবলিত দেশের অধিবাসী। সুতরাং ঈমান, ইসলাম ও দেশ রক্ষার্থে এবং ক্ষমতার মসনদ থেকে চির অভিশপ্ত কাফের অমুসলিমদের অপসারণ কল্পে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া এখন প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয। যে এই ফরয আদায়ে সামান্যতমও শৈথিল্য প্রদর্শন করবে সে যেন কুরআনের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তের বিপক্ষে অবস্থান নিল।

- শাহ্ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ)

ইংরেজ বেনিয়াদের হীন চক্রান্তের দ্বিতীয় পর্ব

ও

আমীরুল হিন্দ হযরত মাওলানা

শাহ্ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) জন্ম: ১৭৪৬ ঈসায়ী - মৃত্যু: ১৮২৩ ঈসায়ী

১৭৩৯ ঈসায়ী সালের কথা, যখন ভারত উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক ইংরেজদের দুঃশাসন জাতির কাঁধে চেপে বসেছিল। তখন সাহ্ ওলীউল্লাহ্ (রহঃ) -এর ঘরে জন্ম নেন এক সৌভাগ্যবান সাহসী সন্তান। যার আলোকোজ্জ্বল ললাটে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল খ্যাতির আলোকচ্ছটা।

ক্ষণজন্মা এই শিশু শৈশবেই পবিত্র কোরআন মুখস্থ করেন। এরপর মাত্র তের বছর বয়সে নাহু, সরফ, মান্তিক, আকাঈদ ইত্যাদিসহ গোটা পাঠ্যসূচীর সব কিতাব পড়ে শেষ করে ফেলেন। তার এই অভূতপূর্ব প্রতিভা বিচক্ষণ লোকদেরকে রীতিমত তাক লাগিয়ে দেয়। ইতিহাসের সুনিপণ, দক্ষ, বিচক্ষণ ও সাহসী এই সন্তান ছিলেন শাহ্ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ)। শাহ্ আব্দুল আযীয (রহঃ) তার পিতার অপরিসীম স্নেহ,

সুচারু তত্ত্বাবধান এবং ঐকান্তিক সুনজরে থেকেই তাঁর তালীম ও তারবিয়তের ধাপগুলো অতিক্রম করেন।

এরপর শাহ্ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) হাদীসের উচ্চতর জ্ঞান লাভের জন্য পিতা শাহ্ ওলীউল্লাহ্ (রহঃ) -এর দরসে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করেন। এভাবে ইলমে হাদীসের জগতেও তিনি বিরাট বুৎপত্তি অর্জন করেন। বর্তমানে গোটা পাকিস্থান, বাংলাদেশ ও ভারতের সমস্ত আলেমদের হাদীসের সনদ তাঁকে কেন্দ্র করে এক হয়ে যায় । কিছু দিন পর তিনি নিজেই ইলমে হাদীসের দরস দিতে শুরু করেন। একদিকে তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির প্রসিদ্ধি দিন দিন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তাঁ সূক্ষ্মদর্শিতা, সূক্ষ্মচিন্তা, যথার্থ প্রমাণ উপস্থাপন এবং ইলম ও জ্ঞানের পরিপক্কতা ক্রমান্বয়ে তাঁকে উজ্জ্বলতর করে তোলে। তখন গোটা ছাত্র সমাজ তাঁর স্বভাবজাত যোগ্যতা ও আল্লাহ প্রদত্ত মেধা ও পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করতে থাকে। তাঁর ক্লাসে কোন কঠিন থেকে কঠিনতর মাসআলা উপস্থাপিত হলেও তিনি মাত্র কয়েক মিনিটে তার সঠিক সমাধান দিয়ে দিতেন। কিতাবের কঠিন থেকে কঠিনতর অধ্যায় এবং চরম দুর্বোধ্য বিষয়গুলোও তার সাগরের উত্তাল তরঙ্গসম আলোচনা খড়-কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে যেত।

ইলমে ওহীর অগাধ পাণ্ডিত্যের পাশাপাশি শাহ্ আব্দুল আযীয (রহঃ) –এর ভূগোল, জ্যামিতি, দর্শন এবং গণিত বিদ্যায়ও ছিল অসাধারণ দক্ষতা। পিতার অবর্তমানে শাহ্ আব্দুল আযীয (রহঃ) যখন রীতিমত পিতার আসনে সমাসীন হলেন তখন তাঁর চোখের কোনে ভেসে ওঠল নির্যাতিত, নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত মানবতার করুণ চিত্র। গোটা ভারতের রাজনীতির প্রাণ কেন্দ্র দিল্লীতে বসে তিনি বেদনার্ত হৃদয়ে, অশ্রুসিক্ত নয়নে প্রত্যক্ষ করেন সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিয়ে আসা শ্বেত ভল্লুকদের অকথা ও অবর্ণনীয় নির্যাতনের গগন চুম্বী পাহাড়।

তখন হযরত শাহ্ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) সবকিছু উজাড় করে দিয়ে এগিয়ে আসেন বেদনার্ত ও শোক-দগ্ধ জনতাকে মুক্ত করতে। তিনি ছিলেন যথার্থ মুসলমান এবং সত্যিকার ত্যাগী ও দেশপ্রেমিক নেতা। কৃষক-শ্রমিক, মাঝি- মাল্লা, জেলে, তাঁতী, কামার, কুমার সকলেরই দুঃখ দুর্দশা ও শোচনীয় অবস্থা শাহ্ আব্দুল আযীয (রহঃ) কে দারুণভাবে ব্যথিত ও প্রভাবিত করে।

বৃটিশ বেনিয়াদের চরম নির্যাতনের মুখে যখন রাজপথ শূণ্য, যখন উৎপীড়িত জনতা নিরুপায় হয়ে দিক-বিদিক ছুটোছুটি করছে, যখন নির্যাতনের তীব্রতায় আলেমদের প্রতিবাদী

কণ্ঠও স্তব্ধ, ঠিক এমনই এক ক্রান্তি লগ্নে শাহ্ আব্দুল আযীয (রহঃ) অবতীর্ণ হোন প্রতিবাদী ভূমিকায়। ভারতের দুদীর্ঘ ইতিহাসে এটাই প্রথম কোন শীর্ষ আলেমের স্বৈরাচারী-জালিম শাহীর বিরুদ্ধে সরাসরি অবস্থান।

বৃটিশ বেনিয়াদের এই চরম নির্যাতনের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে শাহ্ আব্দুল আযীয (রহঃ) গোটা ভারতবর্ষে ফতোয়া জারী করলেন যে, এখন থেকে এদেশের মুসলমানরা 'দারুল হরব' তথা শত্রু কবলিত দেশের অধিবাসী। সুতরাং ঈমান, ইসলাম ও দেশ রক্ষার্থে এবং ক্ষমতার মসনদ থেকে চির অভিশপ্ত কাফের অমুসলিমদের অপসারণ কল্পে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া এখন প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয। যে এই ফরয আদায়ে সামান্যতমও শৈথিল্য প্রদর্শন করবে সে যেন কুরআনের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তের বিপক্ষে অবস্থান নিল।

শাহ্ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) -এর এই ফতোয়া ছিল বৃটিশ বিতাড়নের মধ্য দিয়ে ভারত বর্ষের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ। তাঁর এই ফতোয়ায় ইংরেজদের ভীত কেঁপে ওঠে। সত্যি বলতে কি; ভারতের স্বাধীনতার জন্য এই ফতোয়াই ছিল ভিত্তিপ্রস্তর।

ভারতের পথে-প্রান্তরে অলিতে-গলিতে
এবং ঘরে ঘরে যখন এই ফতোয়ার বাণী পৌঁছে গেল, তখন নির্যাতিত নিপীড়িত মুসলমানগণ উদ্যোম ফিরে পেল। পেল নব চেতনা। শুরু ইংরেজ বিরোধী গণজোয়ার। জুলুম-অত্যাচারের প্রচণ্ডতায় এক সময় যারা ছিল নীরব এখন তারা পুরোদমে সরব। এক সময় যারা ইংরেজ বিরোধী কথা বলতে সাহস পেত না আজ তারা বলিষ্ঠ ও সক্রিয় কর্মী।

শাহ্ আব্দুল আযীয (রহঃ) ছিলেন একজন বিজ্ঞ, সুদক্ষ লেখক এবং একজন অনলবর্ষী বক্তা। জাতির এই দুর্দিনে তিনি লিখনির মাধ্যমে ভারতবাসীকে বুঝিয়ে দিলেন স্বাধীনতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা। পাশাপাশি জানিয়ে দিলেন গোলামী ও পরাধীনতার ক্ষতি ও অপকারিতা । মঙ্গল ও শুক্রবার সপ্তাহে দু'দিন দিল্লীতে তাঁর দরস হত। এই সুবাদে তিনি অত্যন্ত জ্বালাময়ী কণ্ঠে ভাষণ দিতেন যাতে মুসলমানদের মাঝে স্বাধীনতার প্রেরণা এবং তা অর্জনে নব চেতনার সৃষ্টি হয়। শাহ্ আব্দুল আযীয (রহঃ) –এর লিখিত একটি আরবী কিতাব থেকে জানা যায় যে, তিনি শিখ ও মারাঠাদের লুটতরাজের বিরুদ্ধেও বহু কাজ করেছেন। প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন।

তাঁর ক্লাসের পরিধি ছিল বহু বিস্তৃত। যারা তাঁর ক্লাসে আসত তারা

মুজাহিদ ও যোগ্য নেতৃত্বের অধিকারী হয়ে ফিরত এবং দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ে তারা ইংরেজ বিরোধীতার বীজ রোপন করত।

শাহ্ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) সত্তর বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। বিদায় কালে তিনি নিজ হাতে গড়া এমন একদল আত্মোৎসর্গী কর্মী বাহিনী রেখে যান যারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পতাকা হাতে এগিয়ে যান। তাদের মধ্যে হযরত শাহ্ ইসমাইল শহীদ, সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ বেরলভীও ছিলেন। যাঁরা পাঞ্জাবে হিন্দুদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বালাকোটের রণাঙ্গণ সৃষ্টি করে ইসলামের পতাকাকে সমুন্নত করেছেন।

শৃগালের মত শত বৎসর বেঁচে থাকার চেয়ে সিংহের মত এক দিনের জীবনই শ্রেয়। শহীদের রক্ত বৃথা যায় না। এ রক্ত থেকে জন্ম নেয়া জাতি আযাদীর পতাকাবাহীদের জন্ম দিয়ে থাকে।

- ফতহে আলী টিপু সুলতান (রহঃ)

ইংরেজ বেনিয়াদের হীন চক্রান্তের তৃতীয় পর্ব

ও

ফতহে আলী টিপু সুলতান (রহঃ)

হিন্দুস্তানের মাটিতে উপনিবেশিক রূপে আসা অভিশপ্ত ইংরেজ বেনিয়াদের দেড় শ' বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ইতোমধ্যেই তারা বিহার ও বাংলার শাসন ক্ষমতা করায়ত্ব করে নিয়েছে। কুক্ষিগত করে ফেলেছে গোটা শাসন যন্ত্রকে। ফলে গোটা দেশ হয়ে পড়েছে স্মরণ কালের সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখী। রাজপথ থেকে শুরু করে সর্বত্রই বিরাজ করছে ত্রাসের রাজত্ব। পাড়া-মহল্লা, অলি-গলি সর্বত্রই চলছে মহা বিপদের ঘনঘটা।

এহেন পরিস্থিতিতে সামনে এগিয়ে আসার
মত কোন নির্ভীক মুজাহিদও ছিলো না। ছিল না ব্যঘ্র হুংকার ছেড়ে নেতৃত্বের ঝান্ডা হাতে তুলে নেয়ার মত কোন সাহসী মুজাহিদ। তখন নির্যাতিত, নিপীড়িত, নিষ্পেষিত মজলুম মানবতার গগন বিদারী আর্তনাদে গোটা নৈসর্গিক ক্রিয়া স্থবির হয়ে পড়েছিল। ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছিল গোটা উপমহাদেশের আকাশ-বাতাস, যাতনা-ক্লিষ্ট মজলুম মানবতার আহাজারি সপ্তাকাশের দু্র্ভেদ্য ফটক ডিঙিয়ে পৌঁছে যাচ্ছিল আরশে আযীমে। ভারত উপমহাদেশের এমনই এক সন্ধিক্ষণে, এমনই এক ক্রান্তিমুখর পরিস্থিতিতে হায়দার আলী নামক এক সেনাপতির গৃহে জন্ম লাভ করেন পরম সৌভাগ্যশালী এক পুত্র সন্তান, তার ধরাগমন পিতা-মাতার আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং হতভাগা জাতির লালিত স্বপ্নের শুষ্ক উদ্যানে বয়ে দিল বসন্তের সুশীতল সমীরণ। আশার কাননে জন্ম দিল রাশি রাশি পত্র-পল্লব, আর নয়নাভিরাম ফুলফল। ভাগ্য এমনই সুপ্রসন্ন যে, এই নবজাতক শিশুটির গোটা দেহ জুড়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল বিশিষ্ট বুযুর্গ হযরত টিপু সুলতান (রহঃ) -এর রূহানী ফয়েযের ঝলক। যেন এই শিশুটি তাঁরই প্রতিবিম্ব। তাই তাঁর নামের সাথে মিল রেখে এ শিশুটির নাম রাখা হলো টিপু সুলতান।

দিবা-রাত্রির পরিবর্তনের সাথে সমান তালে ঘুরছিল তার জীবন চক্র। অতিক্রান্ত হচ্ছিল জীবনের বিভিন্ন ধাপ। ইতোমধ্যেই মারাঠা সম্প্রদায়ও নতুন ভাবে চাঙ্গা হয়ে উঠল। পানিপথের রক্ত যুদ্ধ, সর্বোপরি তার কচি হৃদয় দর্পনে রেখাপাত করছিল। এসব তাঁর হৃদয়ের রুদ্ধদারে আঘাত হানছিল বারবার। ভাবিয়ে তুলছিল তাকে বারবার শতবার।

সুলতানের বয়স এখনো অল্প । কিন্তু বয়সের এই স্বল্পতা তাকে পিছিয়ে রাখতে পারেনি। তিনি পিতার সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলেন। তাঁর দেহে জেহাদী রক্ত টগবগ করছিল। চেহারায় পরিলক্ষিত হচ্ছিল অনুপম বীরত্বের উজ্জ্বল ছাপ। দিবা-নিশির চক্র আপন গতিতে নিরন্তন এগিয়ে চলছে। এরই মাঝে তিনিও প্রকৃতির আলো বাতাসে বড় হচ্ছেন। জীবনের এই পর্বে জিহাদের মোড় ঘুরে গেল অন্য দিকে। তিনি বীরদর্পে জিহাদে অবতীর্ণ হলেন। লড়তে শুরু করলেন বৃটিশ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে। তাঁর জিহাদী কর্মকান্ড অনেককে হতবাক করে দিল। রণাঙ্গণে তাঁর প্রতিটি শিরা-উপশিরায় বিদ্যুৎ গতিতে দৌড়াচ্ছিল স্বাধীনতা লাভের অদম্য বাসনায় জীবন উৎসর্গকারীর তপ্ত রক্ত কনিকা। তাঁর দেহজুড়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল অনির্বাণ অগ্নিশিখা।

মুজাহিদে মিল্লাত হযরত টিপু সুলতান (রহঃ) ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ় ও বিশুদ্ধ আকীদার মুসলমান। স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি জীবন বাজী রেখে আমরণ লড়াই করে গেছেন। আর এটাই ছিল তাঁর জীবনের চাওয়া-পাওয়া। এটাই ছিল তার মিশন। সুন্নাতে নববীর অনুসরণে তিনি ছিলেন অনুপম দৃষ্টান্ত। একজন বুযূর্গ আলেম থেকে তিনি কোন অংশে কম ছিলেন না। বর্তমান কালে বিভিন্ন সময়ে তাঁর নামে প্রদর্শিত ফটো কশ্মিনকালেও তাঁর ফটো নয়। কারণ তাঁর মুখাবয়ব ছিল ঘন শ্মশ্রুমণ্ডিত

1। জীবনের দীর্ঘ পরিসর
অতিক্রম করে কর্ম জীবনে এসে তিনি তৎকালীন বিশিষ্ট ও স্বনাম ধন্য বীর সেনানী। হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহঃ) কে ঈমানদীপ্ত একটি পত্র লেখেন।

পত্রের ভাষা ছিল এমন,

"মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ কৃপায় ও পরম অনুগ্রহে এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বরকতে মুসলিম সৈন্যদের অশ্বগুলো কাফেরদেরকে এমনভাবে পদপিষ্ট করেছে যে, তারা অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও পরাস্ত হয়েছে।"

1 সূত্রঃ সহীফায়ে টিপু সুলতান।

হযরত টিপু সুলতান (রহঃ) ২রা আগস্ট ১৭৮৬ ইং তারিখে মুহাম্মাদ বেগ খান হামদানীর নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন। ঐ পত্রে তিনি লেখেন যে, "মুসলমানদের উপর নেমে আসা দু্র্ভোগ, দুর্যোগ ও দুর্দিনের জন্য দিল্লীর শাসক গোষ্ঠীর দুর্বলতাই সবচেয়ে বেশী দায়ী। আজও যদি মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে মুসলমানদের হারানো ঐতিহ্য এবং বিলুপ্ত সম্মান-সম্ভ্রম ফিরে আসবে। তখন খোদাদ্রোহী কাফেরদের কোথাও আশ্রয় গ্রহণের ঠাঁই হবে না। সুতরাং মুসলিম নেতাদের এমন কোন কাজ করা উচিৎ নয়, যাতে আপামর মুসলিম জনসাধারণ তথা মুসলিম জনগোষ্ঠীর এই চরম অধঃপতনের হেতু হিসেবে কাল কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর সামনে লজ্জিত ও অপমানিত হতে হয়।"

হযরত টিপু সুলতান (রহঃ) -এর লেখা উল্লেখিত পত্রাবলীর ভাষায় সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে ইসলামের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ও অন্তরঙ্গতা! ফুটে উঠে তার একনিষ্ঠ দেশপ্রেম, ইসলাম, মুসলমান ও স্বদেশের প্রতি তাঁর জীবন উৎসর্গকারী অদম্য স্পৃহা চিঠিগুলোর প্রতিটি শব্দে শব্দে সূর্য কিরণের ন্যায় উজ্জ্বল। তাঁর সারাটি জীবন অতিবাহিত হয় ইংরেজ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানে। ইসলাম ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির

ঐকান্তিক ফিকিরেই তাঁর দিন-রাত অতিবাহিত হত। বলতে গেলে এ ব্যাথায় সারাক্ষণই তিনি ছটফট করতেন।

অন্য এক পত্রে তিনি লেখেন,

"আজকের চিঠিতে আমি ঐ সকল মুসলিম সন্তানকে সতর্ক করেছি যারা ইসলামের সাথে চরম গাদ্দারী করে বেড়াচ্ছে। যা ইসলামী শরীয়তের বিপক্ষে অবস্থানকারী কাফের-মুশরিকদের আচরণেরই নামান্তর। প্রকারান্তরে তা কাফেরদের সাথে ঐক্যমত্যের শামিল। এ কারণেই আমি সম্প্রতি আল্লাহ ও রাসূলের বিভিন্ন বিধান সম্বলিত বহু হাদীস লিপিবদ্ধ করে গোটা দেশে সতর্কবাণী রূপে বিতরণ করে দিয়েছি।"

টিপু সুলতান (রহঃ) মাইসুরের চারটি যুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই করেছেন। এসব যুদ্ধের অধিকাংশে ধারাবাহিকভাবে কাফের সৈন্যদের শোচনীয়ভাবে পরাজয় হয়েছে। এ ছাড়া কর্লেনবেলি নামক স্থানে বৃটিশ বাহিনী তাঁর সাহসী হামলার মুখে টিকতে না পেরে পিছু হটতে বাধ্য হয়। সকল যুদ্ধে তাঁর অস্বাভাবিক বিজয় কাফিরদের অন্তরে এক ভয়াবহ ত্রাসের জন্ম দেয়। ফলে তারা অনেকটা উৎকন্ঠিত হয়ে পড়ে। আর এ কারণেই টিপু সুলতান (রহঃ) কাফেরদের নিকট "বড় শত্রু" হিসেবে সব সময় তাদের আক্রমণের লক্ষ্যে

পরিণত ছিলেন। তিনি এমন একজন বীর যোদ্ধা যাঁর সঙ্গী-সাথীরা ভয়ে পিছ পা হল, অথচ তিনি ইস্পাত-কঠিন দৃঢ়তা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। যাঁর রসদ সামগ্রী বলতে তেমন কিছু ছিলনা। যাঁকে চতুর্দিক হতে শত-সহস্র বাধা বিপত্তি অক্টোপাসের মত জড়িয়ে রেখেছে। গোটা উপমহাদেশের হর্তা-কর্তা তথা ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী যাঁকে চিরদিনের জন্য নিঃশেষ করে দেয়ার মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে বসে আছে, সেই তিনিই একা সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয়ের মালা ছিনিয়ে আনছেন। সত্যিকার অর্থে এটা তাঁর একান্তই আল্লাহ প্রদত্ত কৃতিত্ব বৈ নয়। এত প্রতিকূলতা ডিঙ্গিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভব হয়।

সুলতান টিপু (রহঃ) ছিলেন একজন ইলম ও জ্ঞান প্রিয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন জ্ঞান আকাশের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র। জাওয়াহিরুল কুরআন (পবিত্র কুরআনের মুক্তামালা) যাদুল মুজাহিদীন (মুজাহিদদের পাথেয়), মুফাররেহুল কুলূব (আত্মার প্রশান্তি) এসব প্রখর জ্ঞান সমৃদ্ধ কিতাবাদী তাঁরই একান্ত তত্ত্বাবধানে রচিত হয়। টিপু সুলতান (রহঃ) -এর পররাষ্ট্র বিষয়ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে "নিশানে হায়দারী" নামক গ্রন্থে লেখা হয় যে, তিনি তাঁর শাসনকালীন সময়ে ফ্রান্সের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন।

ইংরেজ বিরোধিতা তখন দু'টি দেশকে একই প্লাটফর্মে নিয়ে আসে। সে সময়ে তিনি আফগানিস্তানের তৎকালীন বাদশাকেও আপন বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন। তখন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেই টিপু সুলতান (রহঃ) -এর রাষ্ট্রদূতগণ তাঁকে হিন্দুস্তানের রাষ্ট্রীয় বিষয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ এবং তাতে হস্তক্ষেপ করতে উৎসাহিত করেছিলেন। আর এ ব্যাপারে তারা বাদশাহ্কে সীমাহীন সাহায্য সহায়তাও করেছিলেন।

সুলতান টিপু (রহঃ) ১৭৮৪ সালে সুলতান আব্দুল হামীদ তুর্কীকে এক পত্রে লেখেন যে, খ্রীষ্টানরা ব্যবসার ছদ্মবেশে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে আজ সেখানকার উপকূলীয় এলাকাগুলো জবর দখল করে নিচ্ছে। তাই ইসলামের খাতিরে আপনি কিছু সৈন্য ও রসদ সামগ্রী পাঠিয়ে আমাদের সাহায্য করবেন বলে আমরা দৃঢ় আশাবাদী। আপনার সৈন্যদের বেতন-ভাতা টিপু (সুলতান) বহন করবে। এই আবেদনের পর তুর্কী সুলতানও তাঁর বন্ধুত্ব ও হিতাকাঙ্ক্ষী সুলভ হস্ত সম্প্রসারিত করেন।

এরপর ইরান এবং অস্থিতিশীল মুঘল শাসকের প্রতিও টিপু সুলতান (রহঃ) সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে ছিলেন। এছাড়াও তিনি হায়দারাবাদের নিজাম এবং মারাঠাদের সাথে সুসম্পর্কের দৃঢ় প্রত্যাশী ছিলেন যাতে

সকলের যৌথ অভিযান ও প্রচেষ্টায় ইংরেজ বেনিয়াদের মোকাবিলা করা সম্ভব হয় এবং মুসলমানরা তাদের হারানো সম্পদ ফিরে পায়। কিন্তু পরিস্থিতি তার অনুকূল হল না। এত কিছুর পরও ইসলামের এই সুযোগ্য সন্তান তাঁর সারাটি জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন শুধু জাতি ও মাতৃভূমির সম্মান ও স্বাধীনতা রক্ষায় সীমাহীন কুরবানীর মাধ্যমে।

যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বীর সেনানী হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহঃ) -এর প্রতি প্রেরিত এক পত্রে হযরত টিপু সুলতান (রহঃ) লেখেন,

"মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অপার অনুগ্রহে আমি শত্রু পক্ষকে নানাভাবে পর্যুদস্ত করে কৃষ্ণ সাগরের ওপারে পালিয়ে যেতে বাধ্য করছি। তখন তারা অত্যন্ত বিনীতভাবে আমার নিকট সন্ধির আবেদন জানালো। অহেতুক মুসলমানদের জীবন নষ্ট না হয় এই চিন্তা করে আমি কিছু কঠোর শর্তে তাদের আবেদন মঞ্জুর করি। কিন্তু এখন আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে, আমি সে সব লোকদেরকে কঠোর শাস্তির সম্মুখীন করব; যারা মুসলমানদেরকে মসজিদে আযান দিতে বাধা দেয়। তাদেরকে এমন কঠিন শাস্তি দেব যেন সকল দুষ্ট প্রকৃতির এবং ভ্রান্ত মতবাদের আগাছা-পরগাছা থেকে দুনিয়াটা সাফ হয়ে যায়। সর্বোপরি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম -এর প্রচারিত দ্বীন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।"

ইতিহাসের অকুতোভয় বীর সেনানী টিপু সুলতান (রহঃ) প্রতিনিয়ত অধিক পরিমাণে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। তাঁর কখনও তাহাজ্জুদ পড়া বাদ পড়ত না। তিনি সব সময় সাহেবে তারতীব ছিলেন।

2 তাঁর অনুপম
লজ্জাশীলতা সম্পর্কে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তাঁর দু'পায়ের টাখনু, হস্তদ্বয় এবং মুখমণ্ডল ব্যতীত গোটা শরীরই সব সময় আবৃত থাকত। কখনও তিনি কারো সামনে অন্য কোন অঙ্গ অনাবৃত করতেন না।

সুলতান টিপু (রহঃ) তাঁর সারাটি জীবনই ইসলামী শিক্ষা প্রসার ও ইসলামী নীতিমালা অনুসরণে অতিবাহিত করেন। তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে মুসলিম জাতি শির উঁচু করে দাঁড়াক এবং ইসলামী আদর্শের প্রজ্জ্বলিত মশাল সর্বত্রই স্ব-কিরণে উদ্ভাসিত হোক। ভারত উপমহাদেশের নিপীড়িত জাতিকে ইংরেজ বেনিয়াদের গোলামীর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার মহান সংগ্রামেই তাঁর পূর্ণ জীবন কেটে যায়। তাঁর সেই বিপ্লবী জীবনের ব্যাঘ্র হুংকার আজও ইংরেজ বেনিয়াদের হৃদয়াত্মা প্রকম্পিত করে তোলে। তাই তাঁর

2 যে পূণ্যবান ব্যক্তির গোটা জীবনে পাঁচ ওয়াক্তের বেশী নামায কাযা নেই তাঁকে ফিকহী পরিভাষায় ‘সাহেবে তারতীব’ বলে।

সেই ঐতিহ্য আজও ধরে রাখা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে যখন মাইসুরের চতুর্থ যুদ্ধ হয় তখন মীর জাফর এবং উমীচাঁদ এর চরম বিশ্বাস ঘাতকতার কারণে জিহাদের ময়দানে মুসলিম যোদ্ধাদের লাশের ডের পড়ে যায়। কিন্তু এই করুণ মুহূর্তেও টিপু সুলতান (রহঃ) আমরণ লড়াই করে যান। এরই মধ্যে তাঁকে তাঁর চিরস্থায়ী বাসস্থানে স্বাগত জানাতে অসংখ্য হুর এগিয়ে আসতে থাকে। এর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে চির আবাস অভিমুখে যাত্রা করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের এই বীর মুজাহিদ এবং মুসলিম জাতির আত্মমর্যাদা জাগ্রতকারী এই মহা মনীষী ৪ঠা মে ১৭৯৯ ইং সনে এই দুনিয়া থেকে পরকালের চির আবাসনে যাত্রা করেন। শহীদ টিপু সুলতান (রহঃ) -এর সমাধী মাইসুর রণক্ষেত্র থেকে আট মাইল দূরে সিরিঙ্গা পট্টম নামক স্থানে অবস্থিত । আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে কবুল করুন। আমীন।

[69]

রাজত্ব করার খায়েশ আমার নেই, পাঞ্জাবের নিপীড়িত নিষ্পেষিত মুসলিম জনতাকে তোমাদের পৈশাচিক অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি দেয়ার জন্যই আমি এসেছি এবং যে পর্যন্ত আমার এই মিশন পূর্ণতা ও সফলতায় ভরে না উঠবে সে পর্যন্ত আমার সৈন্যরা এক মুহূর্তের জন্যও ক্ষান্ত হবে না, এক কদমও পিছপা হবে না।

- রণজিৎ সিং -এর প্রলোভনের প্রত্যাখ্যানে

সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহঃ) -এর হুংকার।

ইংরেজ বেনিয়াদের হীন চক্রান্তের চতুর্থ পর্ব

ও

আমীরুল মুজাহিদীন

হযরত সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ (রহঃ)
জন্ম: ১২০১ হিজরী - মৃত্যু: ১২৪৬ হিজরী

সকল কুদরতের মহান মালিক যার অবয়ব-আকৃতি পরিপাটি করেন এবং বিধাতার অপার মহিমা ও পবিত্র ইচ্ছায় যাকে অনাগত দিনে হিদায়াতের প্রদীপ্ত সূর্য ও বঞ্চিত-নিপীড়িত মানবতার প্রভূত কল্যাণের ফোয়ারা হিসেবে উপস্থাপন করা হবে, তিনি শৈশবকাল থেকেই বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী ধারক হন। এটা চির সত্য, চির ভাস্বর।

সর্বজন শ্রদ্ধেয় উস্তাদ শাহ্ আব্দুল আযীয (রহঃ) থেকে রূহানী ফয়েয -দু'আ-দীক্ষা নিতে এসেছে অসংখ্য অগণিত ভক্তবৃদ্ধ। কিন্তু কারো প্রতি উস্তাদের সান্যিধ্য দীর্ঘায়িত হয়নি। একটা সময় সেখানে কাটানোর পর তারা ফিরে গেছে নিজ নিজ গন্তব্যে। কিন্তু 'রায়ব্রেলীর' এক যুবক যখন এ উস্তাদের কাছে এলো, ইলম হাসিল ও আল্লাহর মা'রেফাত লাভের জন্য; তখন বিচক্ষণ ও প্রাজ্ঞ উস্তাদ তার প্রতি প্রথম দৃষ্টিতেই আঁচ করে ফেলেন যে,

আল্লাহতায়ালা অবশ্যই এই যুবকের মাধ্যমে কোন মহৎ কাজ আঞ্জাম দিবেন।

অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ উস্তাদ যখন জাতির এ ভারী কর্ণধারের অসাধারণ কর্ম-দক্ষতা, যোগ্যতা ও নৈপুণ্যের বিকাশমান প্রদীপ্তি অনুভব করলেন, তখন পরম নিষ্ঠা ও ঐকান্তিক ভালবাসায় তাকে শিক্ষা-দীক্ষার স্তরগুলো অতিক্রম করালেন।

এক দিনেন ঘটনা। হযরত সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ (রহঃ) অধ্যয়নে বসলেন। কিতাব খুললেন পড়ার জন্য। কিন্তু এ কি? তিনি কিতাব খোলার সাথে সাথে কিতাবের কালো লেখা উধাও হয়ে গেল! দৃশ্যপটে ভেসে এল সম্পূর্ণ শুভ্রতা! কিতাবের কালো লেখার এই আত্মগোপন তাকে বিস্মিত করল! যারপর নাই চেষ্টা ও খোঁজাখুঁজি করেও তিনি লেখার কোন অস্তিত্ব পেলেন না। ফলে তিনি নিরুপায় হয়ে উস্তাদের শরণাপন্ন হলেন। উস্তাদের কাছে পুরো ঘটনা সবিস্তরে বললেন। প্রাণ প্রিয় শিষ্যের অভিযোগ বিজ্ঞ উস্তাদকে ভাবিয়ে তুলল। তিনি আঙ্গুল মুখে দিয়ে ভাবতে লাগলেন বিষয়টি! ক্ষণিক পরে বললেন, ওহে বৎস! আজ থেকে তোমাকে কিতাবী ইলম থেকে অমুখাপেক্ষী করে দেয়া হয়েছে। আর ঐসব ইলমের সুবিশাল ভাণ্ডার তোমার অন্তরে ঢেলে দেয়া হয়েছে যা সরাসরি আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত, যার জন্য কোন উপকরণের মাধ্যম গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই।

নির্যাতিত-নিপীড়িত-নিষ্পেষিত মজলুম মাববতাকে উদ্ধার এবং আল্লাহর দ্বীনের ঝাণ্ডা উড্ডীন কল্পে আল্লাহর পথে জিহাদের মত মহা গুরুত্বপূর্ণ ফরয এখন তোমার (নেতৃত্বের) মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। সুতরাং আর বিলম্ব নয়। প্রস্তুতি নাও। জিহাদী খিদমতের জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়ে যাও।

এ ছিল এক আশ্চর্যজনক সুসংবাদ এবং অত্যন্ত আনন্দের বিষয়! কিন্তু এর নেপথ্যে সম্ভাব্য কন্টাকাকীর্ণতা, এই মর্দে মুজাহিদদের দৃষ্টি সীমার আড়ালে ছিল না। তিনি সুস্পষ্ট জানতেন এ পথের রাশি রাশি প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে। কিন্তু স্তূপীকৃত এসব কন্টকাকীর্ণতা অতিক্রম করার ফলাফল, পুরস্কার ও উপঢৌকনের পুরো দৃশ্য এবং মহান আল্লাহর পথে শাহাদাতের সার্বিক কল্যাণময়তার বর্ণাঢ্য চিত্র তাঁর মানসপটে ভাসছিল অহর্নিশ। তাই তিনি কাল বিলম্ব না করে ইসলামের এই মহান খিদমতের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শুরু করলেন কর্মী তৈরী করা। প্রশিক্ষণ দেয়া এবং গ্রামে-গঞ্জে, শহর-উপশহরে ইসলামের সৌন্দর্য ও ঔদার্য বর্ণনা করে লোকদের তাওহীদের পথে আহ্বান করা। তাঁর বক্তৃতায় একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। যে-ই তাঁর বক্তৃতা শুনত সে-ই তাঁর প্রতি ঝুঁকে পড়ত। যেখানেই তিনি একত্ববাদের ন্যায়নিষ্ঠ, সুমিষ্ট এবং

নূরানী বক্তব্য রাখতেন সেখানেই শিরক-বিদআতের উচ্ছিষ্টভোগীরা লজ্জাবনত হয়ে পালাত। যাঁর প্রতিটি বক্তৃতাই হত ইসলামের জন্য দরদ মাখা, নিপীড়িত মানবতার প্রতি সমবেদনা ও সহমর্মিতায় পরিপূর্ণ। ভারাক্রান্ত হৃদয়ের প্রচণ্ড জ্বালা বুকে নিয়ে যিনি পথে-প্রান্তরে গ্রামে-গঞ্জে তাওহীদের সুপেয় পেয়ালা নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন।

মজলুম মানবতার ত্রাহি-ত্রাহি আর্তনাদ তাঁকে মর্মে মর্মে তাড়িত করছিল। তিনি যখন দেখলেন, মুসলমানদের উপর হিন্দু জমিদারদের নির্যাতনের স্ট্রীম রোলারের গতি মন্থর হচ্ছে না, শান্ত হচ্ছে না শ্বেত ভল্লুকদের চাপিয়ে দেয়া স্বৈর শাসনের সর্বগ্রাসী ঝটিকা প্রবাহ। তখন তিনি গোপন আন্দোলনের কর্মসূচী হাতে নিলেন। এই কর্মসূচীর আওতায় সাহসী ও ত্যাগী যুব সমাজকে নিয়ে কাফেলা তৈরী করতে শুরু করলেন। এরাই সর্ব প্রথম অত্যাচারী হিন্দু রাজা রণজিৎ এর বিরুদ্ধে মুক্তির সংগ্রামে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করার শপথ নেয়। এই শপথে তাদের রাজ সৈন্যদের সাথে সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টিও অন্তর্ভূক্ত ছিল।

এরই সূত্র ধরে হযরত সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ (রহঃ) পাঁচ শত সৈন্য নিয়ে সিন্ধু

প্রদেশের হায়দ্রাবাদ হয়ে দাররা বোলানের পথ ধরে আফগানিস্তানে যান। সেখান থেকে পেশওয়ারে ঝটিকা অভিযান চালান। ১৮২৬ সালের ২১ ডিসেম্বরে এই অভিযান পরিচালিত হয়। ঐ সময় রাজা রণজিৎ সিং এর রাজত্ব পেশওয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তখন সর্বত্র চলছিল অন্যায়, উৎপীড়ন, সীমালংঘন এবং স্বৈর শাসন। যখনই আল্লাহর পথের মুজাহিদগণ আক্রমণ করলেন; সাথে সাথে হিন্দু সৈন্যদের মাঝে ত্রাস ছড়িয়ে পড়ল। তারা দিগবিদিগ ছুটোছুটি করতে লাগল। এর পর মুসলমানগণ সেখানে বিজয় কেতন উড্ডীন করলেন। ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হল। আর প্রথম কর্ম দিবসেই সেখানে মদ পান এবং জুয়া খেলার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হল।

এরপর হযরত সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ (রহঃ) স্বীয় মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন। পথিমধ্যে বহু স্থানেই বিভিন্ন ছোট খাটো খণ্ড যুদ্ধে বিজয় এবং কুদরতী সাহায্য এই গাজীদের পদ চুম্বন করতে লাগল। ঈমানী বলে বলিয়ান এই সৈনিকদের সম্মুখ যাত্রা তাঁদেরকে দ্বীনি দাওয়াত এবং তাবলীগ থেকে বিরত রাখেনি। তাঁরা ইসলামের প্রচার মিশন নিয়ে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখলেন। হযরত সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ (রহঃ) - এর নিজ হাতে গড়া এসব মুজাহিদগণ ছিলেন অসাধারণ দুঃসাহসী, বীর-বাহাদুর এবং সুনিপুন সমর কৌশলী।

ওদিকে যুদ্ধের দামামা বাজছিল। ইত্যবসরে রাজা রনজিৎ সিং এর দূত বিজিত এলাকার গভর্নরীর প্রলোভন নিয়ে উপস্থিত হল আমীরুল মুজাহিদীন হযরত সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ (রহঃ) সকাশে। সে বলল, আপনি এবং আপনার সৈন্য বাহিনী যদি সামনে অগ্রসর না হোন তাহলে আপনাকে গভর্নর করা হবে। রণজিৎ সিং - এর এই চিরকুট পাঠ করার সাথে সাথে সাইয়্যেদ শহীদ (রহঃ) রাগে, ক্ষোভে, ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন- আমি ক্ষমতার মোহে এখানে আসিনি। আসিনি কতৃত্ব প্রতিষ্ঠার উচ্চাভিলাসে। এসেছি পাঞ্জাবের নিপীড়িত মুসলমানদেরকে তোমাদের নারকীয় ও পৈশাচিক অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত করতে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার এই মিশন পূর্ণতার আলোয় উদ্ভাসিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার সৈন্য বাহিনীর এক জন সদস্যও পিছপা হবে না। আমরা জীবন দিতে প্রস্তুত, কিন্তু আপোষ করতে ইচ্ছুক নই।

হযরত সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ (রহঃ) -এর
এই জ্বালাময়ী ভাষণের পর ইসলামী মুজাহিদ বাহিনী সম্মুখপানে এগিয়ে গেলেন। 'আকুয়া খট্'ক নামক স্থানে গিয়ে তারা বিজয়ের ঝাণ্ডা উড্ডীন করলেন। এরপর তারা দেখলেন সামনে চতুর্দিকে ঘন অন্ধকার। আর যুদ্ধের অমানিশা তো আছেই। উপরন্তু শত্রু পক্ষ উম্মুক্ত খঞ্জর নিয়ে উম্মাদ হয়ে চক্কর দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে তাদেরকে অবদমিত

করা অসম্ভব। এ সময় আক্রমণ করা হবে অপরিণামদর্শিতার শামিল। উপরন্তু যুদ্ধ সামগ্রী খতম, রসদ সামগ্রী নিঃশেষ, সৈন্য সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। আবার নিজেদেরই কিছু লোক বিশ্বাসঘাতকতা করে বিপক্ষের সাথে যোগাযোগ শুরু করেছে। ইত্যাকার সার্বিক পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বিশ্লেষণ করে এলাকার সমমনা জমিদার, নওয়াব ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ আমীরুল মুজাহিদীন হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহঃ) -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে সামনে অগ্রসর না হওয়ার পরামর্শ দিলেন। তারা বললেন, এখন আমাদের অগ্রসর হওয়া মানেই নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে নিজেদেরকে সঁপে দেয়া এবং সেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা। সাথী ও সমর্থকদের এই হৃত উদ্যোম ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তখন হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহঃ) সকলের উদ্দেশ্যে এক মর্মস্পর্শী ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, সম্মানিত উপস্থিতি! আজ আমাদের স্মৃতি- ভ্রম ঘটেছে। আমরা বাস্তবেই ভুলে গেছি যে, আল্লাহ আমাদেরকে কোন্ দিকে নিতে চাচ্ছেন! আজ আমাদেরকে স্মরণ করতে হবে আমাদের পূর্বসূরীদের উজ্জ্বল ইতিহাস। চির অম্লান সে ইতিহাসের প্রবাহমান অববাহিকায় আমাদেরকেও সিক্ত হতে হবে। করতে হবে তাতে অবগাহন। ভায়েরা আমার! আজ আমার সাথে যারা আছেন, যারা আমার সাথে থাকতে সদা প্রস্তুত, তাদেরকে এ কথা বুঝে নিতে হবে, অনুধাবন

করতে হবে, সাহাবায়ে কেরামের (রাযিঃ) ন্যায় হয়তো আমাদেরকেও কখনো খেজুরের একটি বিচির উপর দিন অতিবাহিত করতে হতে পারে। শাহাদাতের বিছানায় চির নিদ্রার কোলে আশ্রয় নিতে হতে পারে। নিতে হবে বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য এই লীলা ভূমি থেকে চির বিদায়। আজ জীবন থেকে নিরুৎসাহিত হয়ে আত্মীয়-স্বজন-স্ত্রী-পুত্র বিসর্জন দিয়ে, পার্থিব মোহাচ্ছন্নতাকে লাথি মেরে যারা আমার সামনে জীবনকে হাজির করতে পারবে, তারাই আমার প্রিয় সৈনিক। অন্যথায় কারো প্রতি আমার ভ্রুক্ষেপ নেই। আমীরুল মুজাহিদীন বললেন, ভয়ে কাতর হয়ে যদি তোমরা সকলেই আমার সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যাও, তাহলে জেনে রেখো; আমি একাই প্রতিপক্ষের গোটা সৈন্য বাহিনীর সাথে জিহাদ করে জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত!

তাঁর এই ভাষণ ছিল অত্যন্ত জ্বালাময়ী
ও মর্মস্পর্শী। তাঁর এই ভাষণ শুনে সকলেই শিহরিত, আবেগাপ্লুত ও অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ে। চতুর্দিক থেকে কান্নার রোল পড়ে যায়। এ সময় সমস্বরে ধ্বনিত হল- আপনার সাহচর্য ত্যাগের বিনিময়ে যদি আমাদেরকে সাত রাজ্যের রাজত্বও দেয়া হয় তবুও আমরা আপনার সাহচর্য ত্যাগ করব না।

এরপর মুজাহিদ বাহিনী সম্মুখ পানে অগ্রসর হলো, কিছু দূর এগুতেই আতমানজয়ী

নামক এলাকা বিজয় হয়ে গেল। সানকইয়ারী নামক জায়গায় ইসলামী মুজাহিদ বাহিনী বিজয় কেতন উড্দীন করল। টাবল গ্রাম হিন্দুদের করতল থেকে মুক্ত করল। পরিশেষে সে বাহিনী বালাকোটের পাহাড়ের সন্নিকটে পৌঁছে গেলো।

সেখানে মুজাহিদ দল কিছু দিন অবস্থান করলো। এ সময়ে মুজাহিদ বাহিনীকে গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেয়া হল। কয়েক দিন পর শুরু হল যুদ্ধ। প্রথমে কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধ হল। এরপর শুরু হল আসল যুদ্ধ। চারদিকে যুদ্ধের বিভীষিকা। তলোয়ারের ভয়াল ধ্বনি। গোলাগুলির বিকট শব্দ। ইত্যবসরে যুদ্ধের পট পরিবর্তন হয়ে গেল। মুসলমানদের বক্ষ বিদীর্ণ হতে লাগল। মুসলিম সৈন্যরা বদর হুনাইনের মুজাহিদের স্মৃতির পুনরাবৃত্তি ঘটতে লাগলো। পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে রক্তের স্রোত বইয়ে চলল। বালাকোটের মুজাহিদরা শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করতে লাগলো। আসন গ্রহণ করতে শুরু করলো বেহেশতের শীর্ষ আসনে।

আহ্! এ কি অসাধারণ দর্শণীয় দৃশ্য ছিলো! দ্বীনের জন্য কত বড় ত্যাগ। কত বৃহৎ কুরবানী। দশ হাজার সশস্ত্র শত্রুর মোকাবেলায় মাত্র চার পাঁচ শ' মুজাহিদের লড়াই। এরপর আবার আপোষ-রফার জোর লবিং। কিন্তু এত সব উপেক্ষা করে ইসলামের ঝাণ্ডা উড়ানোর উদগ্র বাসনায় প্রাণ পণ লড়াই!

মুজাহিদগণ জীবনের শেষ নিঃশাসটুকু পর্যন্ত জিহাদের ময়দানে অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে। আর ওদিকে আমীরুল মুজাহিদীন হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহঃ) ছলাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর দরবারে কায়মনোচিত্তে বিরামহীন ধারায় কেঁদে যাচ্ছেন। কাঁদতে কাঁদতে তিনি সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন। ইত্যবসরে আকস্মাৎ একটি তীর এসে তাঁর পবিত্র দেহে বিঁধে গেল। এর সুবাদে শত্রু পক্ষ দৌঁড়ে এসে তলোয়ার দিয়ে তাঁর শির বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। আর এভাবেই আল্লাহর পথের মুজাহিদ, অবর্ণনীয় প্রেম-ভালবাসার পেয়ালা নিয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে গেলেন।

এ পর্যায়ে এসে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেল।
যে বালাকোটের পাহাড়গুলো তাকবীরের মুহুর্মুহু ধ্বনিতে প্রকম্পিত হচ্ছিল তা এখন স্তব্ধ হয়ে গেল। কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত প্রজন্মের জন্য বালাকোটের এই স্থানটি একটি ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। জাতি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে তাদের পূর্বসূরী হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহঃ) সহ তাঁর সহচর মুজাহিদগণকে।

ঐতিহাসিক এক বর্ণনা মতে হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহঃ) –এর কর্তিত মস্তকটি নরপিশাচ গোষ্ঠী রাজা রণজিৎ সিং -

এর দরবারে নিয়ে যায়। এরপর রাজা মহাসমারোহে হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহঃ) –এর অসাধারণ শৌর্য বীর্য, সাহসীকতার স্বীকৃতি স্বরূপ একুশবার তোপ ধ্বনীর মাধ্যমে তাঁর মস্তকটি দাফন করে। সে নিজ শত্রুর বীরত্বে স্বীকৃতি দিয়ে বলে, মুসলিম ইতিহাসে আজ পর্যন্ত এমন নির্ভীক অকুতোভয় ও জানবাজ মুজাহিদ জন্ম নেয়নি।

আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য শিরক-বিদ'আতের মুলোৎপাটন এবং হিন্দুত্ববাদী অত্যাচারের চির অবসান। শাহাদাত একটা গর্বের বিষয়; যা কেবল ভাগ্যবানদের কপালেই জুটে।

- শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)

ইসলামের অন্যতম মুবাল্লিগ ও আশেকে রাসূল (ছ.)

হযরত শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)
জন্ম: ১১৯৩ হিজরী - মৃত্যু: ১২৪৬ হিজরী

হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ (রহঃ) -এর পরিবারে জন্ম নেয়া এক যুবক তাওহীদ ও সুন্নাতের প্রচার-প্রসার চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিমার অপবিত্রতা- অসারতা বর্ণনা এবং আল্লাহর একত্ববাদের পয়গাম

বিশ্ববাসীকে শুনিয়ে যাচ্ছেন। বলে বেড়াচ্ছেন 'আমার জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর একত্ববাদ এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যথার্থ অনুসরণের মশাল প্রজ্জ্বলিত করা।' এ যুবকের কথায় যাদুর ত্রিয়া আছে। তার কথায় মানুষ যাদুর মত প্রভাবান্বিত হচ্ছে। তার বর্ণনায়-বক্তৃতায় সততা ও অকপটতার আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তার আহ্বান-ধ্বনিতে মদীনার সুমধুর সুর এবং তার কণ্ঠে বহ্নি- জ্বালা ও মর্ম-পীড়া অনুভূত হচ্ছে। প্রথা প্রচলন-সামাজিকতা, ফ্যাশন ও আধুনিকতার সাথে আপোষহীন এই যুবক পথ হারা জাতিকে বিদ্আত ও শিরক এর অক্টোপাস থেকে মুক্ত করতে প্রাণ-পণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ওয়াজ, উপদেশ দান, তাবলীগ, পথ প্রদর্শন, সত্যের দিকে আহ্বান এবং দিশেহারা জাতির জন্য দু'আ করাই ছিল এই যুবকের একমাত্র কাজ।

ইতিহাসের ক্ষণজন্মা এই যুবক-ই হলেন শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)। হযরত শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) হলেন শাহ্ ওলীউল্লাহ (রহঃ) -এর নাতি এবং শাহ্ আব্দুল গনী (রহঃ) -এর সাহেবজাদা। তিনি ছিলেন আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ)গণের মিশনের যথার্থ অনুসারী। তিনি তার ইতিহাসখ্যাত বিশিষ্ট বুযুর্গ চাচা, হযরত শাহ্ আব্দুল আযীয (রহঃ) -এরও সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন। তাঁর মাধ্যমেই

তিনি আধ্যাত্মিক পথে যাত্রা শুরু করেন। হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ (রহঃ) -এর বংশের এই যুবক একেবারে অল্প বয়সেই ইসলামী শিক্ষার পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত কিতাবদী অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। শৈশব থেকেই হযরত শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) এর অন্তরে জিহাদের এক অদম্য স্পৃহা এবং মুখে সর্বদা একত্ববাদের সুমধুর বাণী প্রতিধ্বনিত হত।

হযরত শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) অসংখ্য কিতাবাদী রচনা করেন। যার মধ্যে শুধু একটি কিতাব তথা 'তাকভিয়াতুল ঈমান' এর উসীলায় তিন লক্ষ হিন্দু ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্দী (রহঃ) -এর মত খ্যাতিমান ব্যক্তিও তাঁর সেই কিতাবের উসীলায় ইসলামের পতাকাতলে শামিল হন। তাঁর প্রাথমিক জীবন দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলামের তাবলীগের মাধ্যমে অতিবাহিত হয়। তাঁর সব ক'টি কিতাবই ছিল সে সব সফরের মধ্যে রচিত।

হযরত শাহ্ আব্দুল আযীয (রহঃ) মাঝে মাঝেই বলতেন, আমার ভাষণ-বক্তৃতা ও আলোচনা শৈলী যথাযথভাবে আয়ত্ব করেছে ইসমাঈল, রচনা ও সংকলন প্রণালী আয়ত্ব করেছে রশীদ উদ্দীন আহমদ এবং তাক্ওয়া ও খোদাভীতি আত্মস্থ করেছে ইসহাক। ইলমী জগতে সবে মাত্র অল্প সময় অতিবাহিত হয়েছে। এরই মধ্যে তিনি তাঁর স্বনাম ধন্য চাচা এবং আধ্যাত্মিক গুরু

হযরত শাহ্ আব্দুল আযীয (রহঃ) -এর অনুমতিক্রমে হযরত সাইয়্যেদ আহমদ (রহঃ) - এর জিহাদী কাফেলায় শামিল হয়ে যান। এর কিছুদিন পর সংবাদ এল যে, পাঞ্জাবের স্বৈরচারী শাসক রাজা রণজিৎ সিং মুসলমানদের উপর অত্যন্ত নির্দয় ও অন্যায়ভাবে নির্যাতনের স্ট্রীম রোলার চালিয়ে যাচ্ছে। ইংরেজ শাসকদের ইঙ্গিতে মুসলিম নিধনের এক সুপরিকল্পিত নীল নকশা হাতে নিয়ে সে অগ্রসর হচ্ছে। যত্রতত্র মসজিদগুলোকে অপবিত্র করছে। মসজিদকে ঘোড়ার আস্তাবল বানাচ্ছে। মুসলিম নারীদের শ্লীলতাহানী করছে। তাদের উপর বখাটেদের লেলিয়ে দিচ্ছে। ইসলামের আক্বীদা বিশ্বাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-কালচার নিয়ে উপহাস করছে। মুসলমানদেরকে যখন-তখন বিভিন্ন ছোট খাটো অজুহাতে দফায় দফায় নির্যাতন চালাচ্ছে এবং তাদের উপর সীমাহীন কঠোরতা প্রদর্শন করছে।

মুসলমাদের উপর এসব নির্যাতনের সংবাদ কর্ণগোচর হতেই হযরত সাইয়্যেদ আহমদ এবং শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) আর স্থিত থাকতে পারলেন না। মুসলমান ভাই-বোনের এই দুর্দশায় নিজেকে স্থির রাখা তাদের জন্য রীতিমত দুঃসাধ্য হয়ে পড়ল। তাই পরামর্শ ক্রমে হযরত সাইয়্যেদ আহমদ (রহঃ) প্রথমে হযরত শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) কে পাঞ্জাবের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন। তিনি আকূড়া, শায়দূ,

তংলী, টবকগ্রাম, শংকপারীসহ আরো বিভিন্ন গুরুত্পূর্ণ এলাকায় জিহাদী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য সফর করেন।

তিনি সফর শেষে ফিরে এসে সকল অবস্থা হযরত সাইয়্যেদ আহমাদ (রহঃ) -এর নিকট ব্যক্ত করেন এবং পরামর্শের মাধ্যমে জিহাদের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন যে, রণজিৎ সিং এর অহংকার, গাদ্দারী এবং নির্যাতনের কঠোর জবাব দেওয়া হবে। এবং পাঞ্জাবে নির্যাতনের শিকার নিরীহ মুসলমানদের রক্ত বৃথা যেতে দেয়া হবে না। ইসলামের দুশমনদের সর্ব প্রকার অত্যাচার-নির্যাতন প্রতিহত করা হবে। এ ব্যাপারে কোন আপোষ কিংবা শিথিলতা প্রদর্শন করা হবে না। প্রয়োজনে চরম ত্যাগ ও কুরবানীর জন্যএ আমাদেরকে সদা প্রস্তুত থাকতে হবে। আর এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সৈন্য বাহিনীতে লোক ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। হযরত শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) ছিলেন হযরত সাইয়্যেদ আহমদ (রহঃ) -এর জিহাদী কাফেলা প্রাণ পুরুষ। তিনি বালাকোটের রণাঙ্গণে বদরী মুজাহিদদের অসাধারণ ত্যাগ ও কুরবানীর ইতিহাসকে পুনর্জিবীত করেন। তিনি ইচ্ছে করলে জিহাদের ময়দান থেকে পাঞ্জাবের রাজার দেয়া পুরস্কার নিয়ে ফিরে আসতে পারতেন। কিন্তু তাওহীদের নেশায় মত্ত ও শাহাদাতের জন্য পাগল প্রাণ এই বীরপুরুষ জীবনে শেষ

রক্ত বিন্দু পর্যন্ত বিলিয়ে দিয়ে লড়াই অব্যাহত রাখেন। কিন্তু শেষ পর্যায়ে শত্রু পক্ষের তলোয়ার এসে তাঁর গর্দানের চামড়া ভেদ করে কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তখন তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে শাহাদাতের মর্যাদা নিয়ে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান।

হযরত শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) -এর এক জীবনীকারের মতে হযরত শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) -এর শাহাদাতের কিছুক্ষণ পূর্বে এক হিন্দু প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কটাক্ষ করেছিলেন। তখন তিনি শপথ করে বলেছিলেন যে, 'আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মারা যাব না যতক্ষণ না তোকে জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করব।' ফলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) -এর গলা কেটে গেছে এমতাবস্থায়ও তিনি তলোয়ার হাতে নিয়ে পলায়নরত সেই হিন্দুর পশ্চাদধাবন করেন এবং তরবারীর কোপে তার শির দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন। উল্লেখ্য, আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দার মুখ থেকে যা বের করেন আল্লাহ তায়ালা তা পূরণের ব্যবস্থা করেন।

হযরত শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) অনাগত প্রজন্মের জন্য জিহাদের এক বিরাট শিক্ষা উপহার দিয়ে যান। রেখে যান অনুপম আদর্শ। স্মরণ করিয়ে দেন বদর, উহুদসহ সব ক'টি

ইসলামী যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামদের (রাযিঃ) রেখে যাওয়া আদর্শ।

শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) মুসলমানদের কল্যাণ এবং ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি সংরক্ষণের কাজেই সারাটি জীবন ব্যয় করেছেন। তিনি ইসলামী ইতিহাসের সোনালী অধ্যায়ে চির ভাস্বর হয়ে আছেন। যুগ যুগ ধরে তিনি হয়ে আছেন মুসলিম মুজাহিদদের প্রেরণার এক মহা উৎস।

আমার ইচ্ছা যে, দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিটি ছাত্রই ইংরেজদের অবস্থানে আঘাত হানবে এবং এই মাদ্রাসার কল্যাণ প্রাপ্ত সকলকেই ইংরেজদের জন্য প্রাণ সংহারক বিষতুল্য হবে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অপরাধে যদি দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিটি ইট খুলে নেয়া হয় তবুও তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত থাকবে।

- মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী (রহঃ)

প্রতিষ্ঠাতা, দারুল উলূম দেওবন্দ

ইংরেজ বেনিয়াদের হীন চক্রান্তের পঞ্চম পর্ব

ও

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত

মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতভী (রহঃ) জন্ম: ১২৪৮ হিজরী - মৃত্যু: ১২৯৭ হিজরী

ইংরেজ স্বৈরাচারীদের হিংস্র থাবা ও অকথ্য নির্যাতনে ভারতবর্ষের নির্যাতিত, নিপীড়িত, নিষ্পেষিত, নিগৃহীত ও নিরীহ মুসলিম জনগোষ্ঠী অতিষ্ঠ হয়ে যখন প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছিল। ক্রমবর্ধমান নিপীড়নে যখন মুসলমানদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গিয়েছিল। যখন প্রায় গোটা বিশ্ব জুড়ে তাদের একক কর্তৃত্ব কায়েম করে মুসলমানদের ধন-সম্পদ, ইজ্জত-আব্রু এমন কি জীবন নিয়েও হোলি খেলায় মেতে উঠেছিল। যখন দৃষ্টি সীমা জুড়ে শুধু মুসলিম নির্যাতন ও মুসলিম নিধনের ভয়াল চিত্রই ফুটে উঠছিল। ইতিহাসের এহেন সন্ধিক্ষণে ভারতবর্ষের প্রতিটি বনি আদমের মনোজগতে জেগে ওঠেছিল স্বাধীনতা লাভ করে সুদীর্ঘ গোলামীর দুঃসহ জীবন থেকে মুক্তির এক অদম্য স্পৃহা। গা ঝাড়া দিয়ে

ওঠেছিল নিদ্রা বিভোর জাতি তাদের অঘোর ঘুম থেকে। চোখ কচলাতে কচলাতে ঘুম থেকে জেগে তারা হতবাক হয়ে পড়েছিল। অবাক চাহনিতে সবাই অপলক নেত্রে এক ভয়াল পরিস্থিতি অবলোকন করছিল। সুগভীর ষড়যন্ত্র এবং সুদীর্ঘ গোলামীর পাতা ফাঁদ তাদেরকে চতুর্দিক থেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল। বৃটিশ বেনিয়াদের এত সব সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্রের কথা সরলমনা মুসলিম জনগোষ্ঠী এতদিন তেমন করে ভাবেনি! সবকিছু উপলদ্ধি করে এবার মুসলিম জনগোষ্ঠী কাফেরদের গোলামীর শৃঙ্খল ছিন্ন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হল। কারণ পূর্বেই ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের অনির্বান মশাল প্রজ্জ্বলিত করেছেন সফল বিপ্লবী হযরত টিপু সুলতান (রহঃ)। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার শ্লোগান তিনিই নিজের তাজা রক্তের হরফে লিখে গেছেন। আর আজো সে চেতনার আগুন নিভে যায়নি। হ্যাঁ, এখন প্রয়োজন সামান্য কিছু খড়কুটোই দিয়ে তা পুনপ্রজ্জ্বলিত করে দেওয়া। তাই দেশ ও জাতির এই ক্রান্তি লগ্নে অতীব প্রয়োজন ছিল মুহাম্মদ কাসিম নানতুভী (রহঃ) –এর মত একজন বীর বাহাদুরের। আর সত্যিই সবাই যেন তাঁর অপেক্ষায় ছিল। এরই সূত্র ধরে তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় ওলামা- মাশায়েখগণ এক জরুরী কনভেশন আহ্বান করেন। সেই কনফারেন্সে উপস্থিত সুধীবৃন্দ সুদীর্ঘ ইংরেজ দুঃশাসনের লোমহর্ষক ফিরিস্তি জাতির সামনে তুলে ধরেন। পেশ

করেন ইংরেজদের সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্রের নীলনকশা, তার ভয়াবহতা ও অনিবার্য পরিণতির চিত্র। এই কনফারেন্সে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় এবং পরাধীনতার জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে শাহাদাত বরণ করে আল্লাহর সান্নিধ্যে গমন করাকে শ্রেয় বলে ব্যক্ত করা হয়। উক্ত পরামর্শ সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, এখন থেকে নিয়মিত সশস্ত্র জিহাদ পরিচালিত হবে এবং অত্যন্ত গোপনে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

জিহাদের প্রাণকেন্দ্র শামেলী রণক্ষেত্রে বিজ্ঞ আলেম, বীর বাহাদুর, সাহসী ও দৃঢ়চেতা যুবকদের একটি বিশাল বাহিনীকে নিয়োগ করা হয়। কারণ এখানেই যে কোন মুহূর্তে ইংরেজদের পক্ষ থেকে হামলার সম্ভাবনা ছিল প্রবল। শামেলী রণক্ষেত্রের এই সুবিশাল ও বিশেষ বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে যিনি নির্বাচিত হন তিনি ছিলেন নন্দিত সিপাহসালার হযরত মাওলানা কাসেম নানতুভী (রহঃ)। প্রকৃত ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বীর মুক্তিযোদ্ধা হযরত মাওলানা কাসেম নানতুভী (রহঃ) তাঁর অনলবর্ষী বক্তৃতা, জিহাদী ভাষণ, সুনিপুন যুক্তিমালা ও অকাট্য প্রমাণাদীর মাধ্যমেই উপরোক্ত পরামর্শ সভায় অংশ গ্রহণকারী ইংরেজ দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন।

তাঁর ঈমানী শক্তির সামনে নিজেদের অস্ত্র ও সৈন্যের অপ্রতুলতার অজুহাত টিকেনি । তিনি উল্টো তাদেরকে প্রশ্ন করেন, আমরা কি সংখ্যায় "বদরের" মুজাহিদদের চেয়েও কম? (রুমুজে-কাওসার-২২৩)

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা কাসেম নানতুভী (রহঃ) -এর ঈমানী চেতনা ও জিহাদী স্প্রীটে অবগাহন করে সকল নবী প্রেমিকদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জিহাদী জযবা উথলে উঠলো। গোটা কনভেনশন ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী চেতনায় উজ্জীবিত ও জিহাদী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে টগবগ করতে লাগল। মুক্তি পাগল মুজাহিদগণ দলে দলে জিহাদী অভিযানে যাত্রা করলো। আর এই শামেলীই ছিল ইংরেজদের প্রধান ও শক্তিশালী ঘাঁটি। এখানে মুসলিম সেনাদের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন কালজয়ী সাধক, আধ্যাত্মিকতার মহান নেতা হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (রহঃ)। তাঁর অপরিসীম দূরদর্শিতা, সার্বক্ষণিক বিচক্ষণতা এবং রূহানী তাওয়াজজুহর পাশাপাশি উঁচু-স্তরের আধ্যাত্মিক শক্তির বদৌলতে মুসলিম সৈন্যদের কোন জিনিসের অপ্রতুলতা অনুভূত হয়নি।

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতভী (রহঃ) যে দিন এ ধরায় আগমন করেন সে দিনটি ছিল রাসূল প্রেমের পাগল, আধ্যাত্মিকতায় শ্রেষ্ঠ

মনীষী, বীর সেনানী হযরত সাইয়্যেদ আহমদ বেরলভী (রহঃ) -এর শাহাদাতের দিন। হযরত মাওলানা কাসেম নানতুভী (রহঃ) সকল বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। শুধু এখানেই শেষ নয়। বরং তিনি ছিলেন ইসলামের একজন সফল, স্বার্থক ও অতুলনীয় দার্শনিক।

হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) হযরত মাওলানা কাসেম নানতুভী (রহঃ) সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তার স্বীয় কিতাব "নকশে হায়াত" এ লেখেন, শাহ্ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) এর ইলমী গভীরতা অনস্বীকার্য কিন্তু হযেত মাওলানা কাসেম নানুতভী (রহঃ) –এর লেখা কিতাবে ইলম ও প্রজ্ঞার যে গভীরতা পরিদৃষ্ট হয়, তা হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ (রহঃ) -এর কিতাবেও নেই।

স্যার সাইয়্যেদ আহমদ ছাহেব সুদীর্ঘ
সময় পর্যন্ত হযরত মাওলানা কাসেম নানতুভী (রহঃ) -এর সহপাঠী ছিলেন। চিন্তা-চেতনায় ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও তিনি হযরত নানতুভী (রহঃ) সম্পর্কে এক জায়গায় লিখেছেন,

"সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক হযরত ইমাম গাযযালী (রহঃ) - এর তিরোধানের পর ইসলামের ইতিহাসে হযরত মাওলানা কাসেম নানতুভী (রহঃ) -এর মত বড় দার্শনিক আজ পর্যন্ত আর দেখা যায়নি।"

ভাবতে অবাক লাগে! যাঁর দিগন্ত প্রসারী পাণ্ডিত্যের খ্যাতি, যাঁর ইলমের সামনে সমগ্র বিশ্ব অবনত। এমন এক বিশ্ব-নন্দিত ও জগত-খ্যাত ব্যক্তিত্ব কিভাবে নিজের আরাম-আয়েশকে জলাঞ্জলি দিয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণার্থে ১৮৫৭ সালের সুকঠিন, বিপদসংকুল ও সংগ্রামী জীবন কাটানোর কন্টকাকীর্ণ পথ বেছে নিলেন। নিজের একটু আরাম-আয়েশের চিন্তাও তিনি করলেন না। নিপীড়িত জাতির চরম দুর্দশায় দারুণভাবে ক্লিষ্ট হয়ে তিনি নিজের সকল বিলাসী উপকরণ সমূহ পরিত্যাগ করে নিরলস ভাবে আজীবন সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন জাতিকে পরাধীনতার জিঞ্জির থেকে মুক্ত করার সুমহান বাসনা নিয়ে।

১৮৫৭ সালের সংগ্রামের পর যখন কুফরী শক্তির মুখোশ খুলে গেল, তখন তের হাজার আলেম-উলামাকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে অভিশপ্ত ইংরেজগোষ্ঠী মহা তৃপ্তির ডেকুর তুলছিল, যখন কুফুরী ও খোদাদ্রোহীতার বিষাক্ত ছোবল গোটা দেশকে গ্রাস করে ফেলেছিল, কোথাও হিদায়েতের কোন আলোক-রশ্মি পরিলক্ষিত হচ্ছিল না, যখন পথ হারা জাতিকে সঠিক দিশা দেয়ার মত কোন দিশারী খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, যখন ফিৎনা-ফাসাদের ঘোর অমানিশায় চারদিক অন্ধকারাছন্ন। সর্বোপরি যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিশাল-বিস্তীর্ণ আকাশেও যেন রহমতের কোন তারকা

দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না- জাতির ঠিক এমন এক ক্রান্তিলগ্নে, ইতিহাসের এমনই এক সন্ধিক্ষণে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা কাসেম নানতুভী (রহঃ) ইসলামের আলোকোজ্জ্বল মশাল ও অনির্বাণ প্রদীপকে এই উপমহাদেশে চিরদিন প্রজ্জ্বলিত রাখার সুমহান বাসনা নিয়ে ভারতের ছোট একটি বসতি এলাকায় একটি দ্বীনি মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপন করেন। এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে এও ছিল যে, এর মাধ্যমে বিশ্বময় ইসলামের জাগরণ সৃষ্টি হবে। এমন লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী আলেম সৃষ্টি হবেন, যাঁরা ইসলামের সুমহান ঝাণ্ডাকে চিরদিন সমুন্নত রাখবেন। ইংরেজদের অত্যাচার-ক্লিষ্ট মানবতাকে জিহাদী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করবেন। ফলে ইংরেজ হায়নাদের জুলুম-নির্যারন ও অত্যাচার-অনাচারের চির অবসান ঘটবে।

বর্তমান সময়ে মুসলিম বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার আসনে আসীন দেওবন্দের ছোট্ট পল্লীতে অবস্থিত এই ইসলামী ইউনিভার্সিটিটি হযরত মাওলানা কাসেম নানতুভী (রহঃ) -এর শিক্ষা জীবনের একটি স্বপ্নেরই বাস্তবায়ন। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা কাসেম নানতুভী (রহঃ) এর জীবনী গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ছাত্র জীবনে তিনি একবার স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি কা'বা শরীফের ছাদে দন্ডায়মান। ইত্যবসরে

তাঁর দেহ থেকে পানি নিসৃত হয়ে হাজার হাজার নদী-নালা বয়ে যাচ্ছে। বিস্ময়কর এই স্বপ্নটি তাঁকে বিস্ময়াভিভূত করে তোলে। পরে তিনি স্বপ্নের এই বৃত্তান্ত তাঁর সম্মানিত ও সুযোগ্য পিতার নিকট বর্ণনা করেন। উত্তরে তাঁর পিতা বলেন, এর ফলাফল হল তোমার মাধ্যমে দ্বীনি ইলমের আলো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে! তুমি হবে এর উৎস!

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা কাসেম নানতুভী (রহঃ) ছিলেন সুন্নাতে নববীর অত্যন্ত সযত্ন পাবন্দ। সুন্নাতের প্রতি তাঁর এতই অনুরাগ ছিল এবং সুন্নাতের উপর চলতে তিনি এতটাই অভ্যস্ত ছিলেন যে, ১৮৫৭ সালের যুদ্ধের পর যখন তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী হয় তখন তিনি তিন দিন আত্মগোপন করে থাকেন। তিন দিন পর তিনি বেরিয়ে এলে তাঁর সাথী-সঙ্গীরা তাঁকে পুণরায় আত্মগোপন করার পরামর্শ দিলেন। উত্তরে তিনি বললেন, আমার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত কালে মাত্র তিন দিন পর্বত গুহায় আত্মগোপন করেছিলেন। তাই আমিও মাত্র তিন দিনই আত্মগোপন করেছি। এর বেশী এক মুহূর্তও আত্মগোপন করে থাকা আমার জন্য আদৌ শোভনীয় নয়। আমার লজ্জা বোধ হয় যে, কি করে আমি প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে বেশী সময় আত্মগোপন করে থাকি।

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা কাসেম নানতুভী (রহঃ) ছিলেন একজন খালেস, নিঃস্বার্থ ও দুনিয়া বিমুখ আলেম। নিম্নে ঘটনাটি এরই জ্বলন্ত প্রমাণ - একবার হায়দারাবাদের নবাব তাঁর নিকট চিঠি লিখল যে, আপনি আমার দরবারে আসুন। এখানে আপনি প্রত্যহ মাত্র এক ঘন্টা করে পড়াবেন। সম্মানী হিসেবে আপনাকে প্রতিমাসে সাত শ' টাকা প্রদান করা হবে। নবাবের চিঠির উত্তরে মাওলানা কাসেম নানতুভী (রহঃ) লিখলেন, নবাব সাহেব! আমি মাদ্রাসা থেকে দশ টাকা বেতন পেয়ে থাকি। এর ছয় টাকায় আমার যাবতীয় প্রয়োজনাদী পূরণ হয়ে যায়। দু'টাকা পিতার জন্য পাঠিয়ে দেই। আর দু'টাকা আমার অবশিষ্ট থেকে যায়। এই দু'টাকা আমি কোথায় খরচ করবো সে জায়গা খুঁজে পাচ্ছি না। আর আপনি যে আমাকে এত টাকা দিতে চাচ্ছেন, তা আমি কোথায় খরচ করবো? হযরত মাওলানা কাসেম নানতুভী (রহঃ) - এর দুনিয়া বিমুখ উত্তর পেয়ে নবাব এত বেশী প্রভাবিত হন যে, নবাব সাহেব হযরতের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য চলে আসেন। নবাব সাহেব ফিরে যাওয়ার সময় এক থলে রৌপ্য মুদ্রা হযরতের সমীপে হাদীয়া স্বরূপ পেশ করেন। হযেত মাওলানা কাসেম নানতুভী (রহঃ) তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। এবং পূর্বোক্ত উজর পেশ করেন। ফলে নবাব সাহেব

ফেরার সময় ঐ টাকাগুলো হযরতের পাদুকাযুগলের মধ্যে ঢেলে দিয়ে চলে যান। পরে মাওলানা কাসেম নানতুভী (রহঃ) জুতা পরিধান করতে গিয়ে দেখেন জুতার মধ্যে টাকার ঢের পড়ে আছে। এ অবস্থা দেখে জুতা ঝেড়ে টাকাগুলো ফেলতে ফেলতে বললেন, এই দেখ! আমরা দুনিয়াকে এত উপেক্ষা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করি কিন্তু তবুও তা শেষ পর্যন্ত আমাদের জুতায় এসে পড়ে থাকে। এ বলে তিনি গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা করলেন। আর একটি বারও তিনি ঐ টাকাগুলোর দিকে ফিরে তাকালেন না।

প্রকৃতপক্ষে এ আন্দোলন তথা ইংরেজ বেনিয়ার মোকাবেলা করা, তাদের ইসলাম বিধ্বংসী কর্ম-কাণ্ড ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং ভারতবর্ষ থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করার জন্য দুর্বার ও সফল আন্দোলন পরিচালনা করার মত দুঃসাহস হযরত মাওলানা কাসেম নানতুভী (রহঃ) –এর ছিল। শুধু তাই নয়, তাঁর তিরোধানের পরও এ দুর্বার আন্দোলন যেন চিরকাল অব্যাহত থাকে সেজন্য তিনি সংগ্রামী আলেম তৈরীর কারখানা ঐতিয্যবাহী বিদ্যাপীঠ "দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসা" রেখে যান। যে বিদ্যাপীঠ যুগ যুগ ধরে শিক্ষা, চরিত্র, রাজনীতি, আধ্যাত্মিকতা ও জিহাদের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী অবদান রেখে চলেছে।

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা কাসেম নানতুভী (রহঃ) দরস ও তাদরীসের পাশাপাশি লিখনির জগতেও বিরাট অবদান রেখে যান। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা ত্রিশ (৩০) এর অধিক।

এ মহা মনীষীর সংগ্রামী জীবন সত্যিই আমাদের জন্য একটি অনুসরণীয় আদর্শ, চেতনার অগ্নিমশাল।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা আমাদের বৈশিষ্ট্য। শংকা ও বিপদের ঘোর অমানিশা আমাদেরকে বিন্দু মাত্রও ভীত সন্ত্তস্ত করতে পারবে না। পরাধীনতার প্রতিটি মুহূর্ত লাঞ্ছনা ও অপদস্ততার আয়না স্বরূপ। তাইতো আমার প্রতি যাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে তাদের কেউই জিহাদের ফরয আদায়ের শৈথল্য প্রদর্শন করবে না।

- হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহঃ)

ফকীহুল উম্মত

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহঃ) জন্ম: ১২৪৪ হিজরী - মৃত্যু: ১৩২৩ হিজরী

বালাকোটের অকুতোভয় মুজাহিদীনে কেরাম যে বৎসর পেশওয়ারের প্রতিটি অঞ্চলের উপর সর্বাত্মক আক্রমণ চালিয়ে ছিলেন এবং রাজা রণজিৎ সিৎ এর সেনাপতিদেরকে একের পর এক পরাজিত করে চলছিলেন সে বৎসরই গাংগুহের পল্লী এলাকায় একজন আদর্শ সন্তানের

শুভাগমন ঘটে। সে দিন গোটা এলাকা এক অব্যক্ত জান্নাতী সৌরভে বিমোহিত হয়ে পড়ে। ফেরেশতাকূল কর্তৃক সেদিন সর্বত্র এ অদৃশ্য বাণী ঘোষিত হয় যে, আজ উম্মতে মুহাম্মাদির একজন শ্রেষ্ঠ ফেকাহশাস্ত্রবিদ ও সংস্কারকের শুভাগমন ঘটেছে। আর তিনিই হলেন মহা মনীষী হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ)। তিনি যখন সপ্তম বৎসরে উপনীত হন তখন থেকেই তার একনিষ্ঠ খোদা প্রেমিক ও অনুপম ধর্মনিষ্ঠ প্রিয় জননীর নিকট পবিত্র কালামে পাকের শিক্ষা গ্রহণ শুরু করেন। ধীশক্তির পরম ও চরম উৎকর্ষতার ফলে তিনি অতি অল্প সময়েই পবিত্র কুরআন শেষ করেন।

এগার বছর বয়সে একবার তিনি মৌলভি মুহাম্মাদ বখ্শ্ (রহঃ) -এর কাছ থেকে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের অনুবাদ শুনেন। আয়াতটির ভাবার্থ হল "বিচার দিবসে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশে অপরাধীদেরকে এবং নেককারদের পৃথক করে দেয়া হবে"। এটা শোনার পর তিনি সারা রাত কাঁদতে কাঁদতে কাটিয়ে দিলেন। তাঁর এহেন অবস্থা দেখে তাঁর মা তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, আম্মাজান! আমার এ কান্না শুধু এই ভয়ে যে, বিচার দিবসে আমি যেন অপরাধীদের অন্তর্ভূক্ত না হই!

বাল্যকাল থেকেই হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ) –এর মধ্যে খোদাভীতি এত অধিক মাত্রায় জাগরুক ছিল যে, তিনি দিবা- রাত্রির পুরো সময়টাই শুধু ইবাদত বন্দিগীতে লিপ্ত থাকতেন। তাঁর সময়কার বিশিষ্ট আলেমগণও তাঁর এই অভূতপূর্ব ও দুর্লভ সাধনা দেখে হতবাক হয়ে যেতেন।

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ) শিক্ষা জীবনের প্রাথমিক স্তরগুলো গাঙ্গুহতেই সমাপ্ত করেন। পরে ১৮৪৪ ঈসায়ী সনে তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য দিল্লী গমন করেন। সেখানে তিনি হযরত মাওলানা শাহ্ আব্দুল গণী (রহঃ) এবং মাওলানা মামলূক আলী (রহঃ) -এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁদের দরসে শামিল হয়ে যান। তাঁর স্মরণ শক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর । ধীশক্তি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ম। মীর জাহেদ, কাজী ছদরা ইত্যাদি দর্শন ও তর্ক শাস্ত্রের কঠিন থেকে কঠিনতর গ্রন্থসমূহের অদ্যোপান্ত তাঁর হুবহু মুখস্থ ছিল।

মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী এবং মাওলানা কাসেম নানতুভী (রহঃ) উভয়ে সহপাঠী ছিলেন। তাঁরা একই সাথে পড়া-লেখা করেন। তাঁদের উস্তাদগণ তাঁদের আল্লাহ প্রদত্ত বৈশিষ্টাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করতেন। অগাধ জ্ঞান, আসমানী ইলম ও খোদাভীতির এ দুই মহান সূর্য একই সাথে হাজী এমদাদুল্লাহ

মুহাজেরে মাক্কী (রহঃ) -এর নিকট ইসলাহী বায়াত গ্রহণ করেন।

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ) মাত্র চল্লিশ দিনের মাথায় স্বীয় পীরের কাছ থেকে খেলাফত লাভে ধন্য হন। এই মহান প্রাপ্তির পাশাপাশি তিনি একজন বিশিষ্ট জমিদার ও প্রচুর সম্পদশালীও ছিলেন। ছিলেন অঢেল ভূ সম্পত্তির অধিকারী। কিন্তু তাঁর চলাফেরা ও পোশাক পরিচ্ছদ দেখলে মনেই হত না যে, তিনি একজন অঢেল ধনৈশ্বর্যের মালিক। তিনি সব সময় অনাড়ম্বর ও বিলাসিতা বিবর্জিত জীবন যাপন করতেন। দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, সুন্নাতের একনিষ্ঠ অনুকরণ, শরয়ী মাসআলা-মাসায়েলে ঈর্ষনীয় ব্যুৎপত্তি, রুটিন মাফিক অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা প্রভৃতি ছিল তাঁর উল্লেখ যোগ্য বৈশিষ্ট্য। তাঁর অনাড়ম্বর জীবন যাপন দেখে তাঁকে দৈন্যদশাগ্রস্ত ভেবে একবার এক লোক তাঁকে স্বর্ণ তৈরির কিছু উপাদানসহ একটি ফর্মূলা শিখিয়ে দিলো। তিনি বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীকে বললেন, এগুলো আলমারিতে রেখে দাও। স্ত্রী তাই করলেন। এদিকে সময়ের চাকা ঘুরে তা এগিয়ে গেল বহুদূর। কেটে গেল দীর্ঘ এগারটি বছর। কিন্তু সময়ের এই দীর্ঘ পরিসরে কোন দিন একটি বারের জন্যও হযরতের সুযোগ হয়নি সে উপাদানগুলোর দিকে ফিরে তাকাবার। ওদিকে দীর্ঘ এগার বৎসর পর ঐ লোকটি এসে হযরতের

কাছে স্বর্ণ তৈরি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন , জিনিসগুলো আলমারিতে যেভাবে রেখেছি সম্ভবত আজও সেভাবেই আছে। কারণ এই সুদীর্ঘ সময়ে আমার দ্বীনী কাজে এত ব্যস্ত ছিলাম যে এমন কোন ফুসরত আসেনি যে , আমি স্বর্ণ তৈরী করে বিক্রি করব এবং সে অর্থ দিয়ে আমার জীবন যাপনে আড়ম্বরতা ফিরিয়ে আনবো। সুতরাং তুমি তোমার উপাদানগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কারণ ওটা আমার কোন কাজে আসবে না বরং উল্টো আমার সময় নষ্ট করবে। পরে তিনি সেগুলো ঐ লোককে ফিরিয়ে দিলেন।

ফিকাহ্ শাস্ত্রে হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ) -এর ব্যুৎপত্তি , অগাধ পাণ্ডিত্য ও পারদর্শিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লামা আন্ওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (রহঃ) বলেন, **شـيخنا الجنجـوهي أفقـه من الشامي** অর্থাৎ আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন আল্লামা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ) ইমাম শামী (রহঃ) থেকেও বড় ফকীহ ও আইনজ্ঞ ছিলেন। বাস্তবও তাই যে , তিনি তাঁর সমসাময়িক কালের উদ্ভুত বিভিন্ন জটিল সমস্যা সুতীক্ষ্ন দৃষ্টি , অসাধারণ জ্ঞান গভীরতা এবং অগাধ পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে সমাধান করেছেন। উপস্থিত বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম দর্শিতায় তাঁর এই অসাধারণত্বের কারণে তৎকালে গোটা ভারত উপমহাদেশে তাঁর কোন জুড়ি খুঁজে পাওয়া ছিল রীতিমত দুরূহ।

তিনি তাঁর পূর্বসূরী আলেম এবং জগদ্বিখ্যাত ইসলামী মনীষীদের ন্যায় বিবিধ দুর্লভ গুণাবলীর পাশাপাশি আযাদীর সংগ্রামের একজন সফল, স্বার্থক, নির্ভীক ও সংগ্রামী সিপাহসালার ছিলেন। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় যখন যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। যুদ্ধের বিভীষিকা চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল। শামেলীর রণাঙ্গনে যে দেশপ্রেমী হাজার হাজার আলেম যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলেন। তখন হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ) তাদের বিরাট একটি জামা'আতের নেতৃত্বে ছিলেন। সেই স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং চির স্মরণীয় অবদান রাখেন।

যুদ্ধ সমাপ্তির পর তিনি পাঞ্জালাসায়
গমন করেন। সেখানে অল্প কিছু দিন না যেতেই তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী হয়ে যায়। তিনি ব্যাপারটি আঁচ করতে পেরে অতি সন্তর্পনে সে স্থান ত্যাগ করে রামপুর চলে যান। সেখানে দিন কয়েক না যেতেই একদিন সাহারানপুরের কর্ণেল গার্ডেন ফ্রান্সেস গোলাম আলী একদিন সত্তর সদস্যের একটি সৈন্য বাহিনী নিয়ে গাঙ্গুহে তল্লাশি অভিযান চালায়। মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ) সম্ভাব্য পুলিশী অভিযানের গোপন সংবাদ পেয়ে সেখান থেকে আত্মগোপন করেন। এদিকে পুলিশ বাহিনী ব্যাপক অভিযান

চালিয়ে সেখান থেকে মাওলানা রশীদ আহমদ মনে করে তাঁর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ চেহারার ব্যক্তি তাঁরই মামাতো ভাই মাওলানা আবুন নসরকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। পরে অবশ্য আসল পরিচয় জানার পর তাকে ছেড়থ দেয়া হয় । পরবর্তীতে সৈন্যরা কৌশল পাল্টে দেয়। তারা বিভিন্ন জায়গায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টীম পাঠায় এবং অতর্কিত অভিযান চালায়। কিন্তু এত সবেও ইংরেজ প্রশাসন মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী (রহঃ) গ্রেফতার হওয়াটাই কল্যাণকর মনে করলেন এবং নিজেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে পুলিশ বাহিনীর কাছে আত্নসমর্পণ করলেন।

ইংরেজ সৈন্যরা হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী (রহঃ) কে হাতে হাতকড়া এবং পায়ে বেড়ী পরিয়ে মুজাফ্ফর নগর কারাগারে নিয়ে যায়। সেখানে তিনি অত্যন্ত কষ্টে ও দুঃসহ অবস্থায় ইংরেজ দুরাচার কর্তৃক নির্যাতনের ছয়টি মাস অতিক্রম করেন। শত কষ্টের মাঝেও তিনি সেখানে অবসর থাকেননি। বিভিন্ন শ্রেণীর কয়েদীদের মাঝে নিরলসভাবে দ্বীনি তা'লীম, ওয়াজ-নসীহত ইত্যাদি চালিয়ে গেছেন। ছয় মাসের এই অন্তরীণ জীবনে তাঁকে অবর্ণনীয় জুলুম-নির্যাতন ও বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। ভাবতেও অবাক লাগে যে, একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি, ধনাঢ্য পরিবারের উচ্চ শিক্ষিত সভ্য-শান্ত যুবক স্বদেশ ও

স্বজাতির জন্য বিভিন্ন ধরণের বিপদ-আপদ ও জুলুম-নির্যাতন স্বতঃস্ফুর্ত চিত্তে বরণ করে আমরণ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে ক্ষণিকের জন্যও একটু পিছপা হচ্ছেন না। অপ্রতিরোধ্য গতিতে কেবল সম্মুখপানে এগিয়েই চলেছেন। বাস্তবিক পক্ষে চিন্তা করলে দেখ যায় ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে প্রধানতম হাতিয়ার ছিল এমন কয়েকজন মহান ব্যক্তিত্বের আত্মদান; যাঁরা দুনিয়ার প্রতি ছিলেন সম্পূর্ণ নিরাসক্ত, ছিলেন দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের প্রতি যারপর নাই নিরুৎসাহী। সাধারণ জীবন যাপনই তাঁদের কাম্য ছিল।

মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ) যখন ইংরেজদের হাতে বন্দী তখন তাঁর সতী- সাধ্বী স্ত্রী, যার পিতা মৌলভী তকীউদ্দীন (রহঃ) কে ইংরেজ জালিমরা ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে শহীদ করেছিলো। হেসে হেসে বলছিলেন -

গতকাল আমার আব্বাজানও এই ইংরেজ হায়েনাদের জুলুম-অত্যাচারের শিকার হয়েছিলেন। আর আজ আমার স্বনামধন্য স্বামীও যন্ত্রণাদায়ক কঠিন কারাজীবন বরণ করেছেন। আজ আমি আমার পিতা ও স্বামীর বীরত্ব-সাহসীকতার উপর যতই গর্ব করি না কেন তা নিতান্তই কম।

চরম নির্যাতন-নিপীড়নের পর ছয় মাসের মাথায় মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ) মুক্তি লাভ করেন। তাঁর মুক্তি লাভের পর

জালিম শাসকগোষ্ঠী মুরীদ ও মেহমানদের ছদ্মাবরণে তাঁর পেছনে অসংখ্য গোয়েন্দা লাগিয়ে দেয়। তারা তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত এভাবেই তাঁর পেছনে লেগে ছিল। তিনি সারাটি জীবন ইসলামের প্রচার-প্রসারের কাজেই বিলিয়ে দেন। প্রাণ নিবেদন করেন দেশ ও জাতির মুক্তি সংগ্রামে। এ সংগ্রাম করতে গিয়েই তিনি জেল-জুলুম থেকে শুরু করে ইংরেজ দুঃশাসনের অকথ্য অবর্ণনীয় নির্যাতন সহ্য করেন।

মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ) সুদীর্ঘ ৪৯ বৎসর যাবত ইলমে হাদীসের দরস দিয়ে যান। ফলে ভারত ছাড়াও বার্মা, কাবুল, আফগানিস্তানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর অসংখ্য শিষ্য ছড়িয়ে আছেন। আছেন তাঁর ঐকান্তিক প্রজ্ঞার স্পর্শে উপকৃত অগণিত ভক্তবৃন্দ। হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ) নম্রতা, ভদ্রতা, শিষ্টাচার ইত্যাদিসহ অসংখ্য মহৎ গুণাবলীর আধার ছিলেন। অনাগত জাতির জন্য রেখে যাওয়া তার অমূল্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে "কাওকাবুদ্দুররী, হেদায়াতুশ শিয়া" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কারাভোগ উদ্দেশ্য নয়, তবে তা যদি উদ্দেশ্য হাসিলে বাধা হয়, তাহলে তা অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে। উপমহাদেশের আযাদী আন্দোলনের জন্য যদি আমাকে কেটে টুকরো টুকরো করা হয় তাহলেও কোন ভয় নেই। হে তরুণ সম্প্রদায়! জাতির আগামী দিনের কর্ণধার! যখন আমি দেখলাম, আমার এ হৃদয় যন্ত্রণার (যে যন্ত্রণায় আমার হাড্ডি পর্যন্ত গলে যাচ্ছে) সমব্যাথী মাদ্রাসা ও খানকায় কম এবং স্কুল-কলেজে বেশী, তখন আমি আলীগড় (ইউনিভার্সিটির) দিকে পা বাড়িয়েছি। যদি যুব সম্প্রদায় কাফন পড়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহলে দেশ তাড়াতড়ি আযাদী লাভ করবে। বিপদের প্রচণ্ড ঝড় আমাকে নিজ গতিপথ থেকে একচুলও বিচ্যুত করতে পারবে না। রেশমী রুমাল আন্দোলনের উদ্দেশ্য গোটা

বিশ্ব থেকে ইংরেজদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া।

- হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী (রহঃ)

ইংরেজ বেনিয়াদের হীন চক্রান্তের ষষ্ঠ পর্ব

ও

ইসলামী আন্দোলনের বীর সিপাহসালার

হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী (রহঃ) জন্ম: ১২৬৮ হিজরী - মৃত্যু: ১৩৩৯ হিজরী

ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বর্ণ খচিত ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে যদি নির্ভীক ও সংগ্রামী

সিপাহসালার হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী (রহঃ) -এর স্বর্ণোজ্জ্বল নাম বাদ দেয়া হয় তাহলে শুধু আমারই নয় বরং সকল ঐতিহাসিকের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী সেই ইতিহাস অপূর্ণ থেকে যাবে। এই নির্ভীক মুজাহিদের উজ্জ্বলতম জীবন কথা এবং তাঁর বিশ্বজননী চিন্তাধারার আলোচনা সংযোগেই আসবে ইতিহাসের গ্রহণযোগ্যতা।

হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (রহঃ) এমন এক ব্যক্তিত্ব; যাঁকে 'তাহরীকে খেলাফত' কালে 'শাইখুল হিন্দ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। তিনি ছিলেন সাহারানপুর জেলার দেওবন্দ নামক স্থানের অধিবাসী। জীবন চক্রের এক পর্যায়ে তিনি যখন মিরাঠ অবস্থান করছিলেন ঠিক তখনই বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয়। ১৮৫৭ সালের ঘটনাবলী তাঁর খুব একটা দেখা হয়নি, আর তা স্মরণও থাকার কথা নয়। কারণ তখন তিনি সবে মাত্র শৈশব অতিক্রম করে কৈশোরে পা দিচ্ছিলেন। তবুও সাম্রাজ্যবাদের জুলুম-নির্যাতন ও অত্যাচার-উৎপীড়নের চিত্র সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও তাঁর হৃদয় দর্পণে অঙ্কিত ছিল।

এদিকে দিন যতই অতিবাহিত হচ্ছিল ইংরেজদের অত্যাচার, অবিচার এবং নিপীড়ন নিগৃহীত মানবতার অব্যক্ত হৃদয় জ্বালা ততই ক্রমবর্ধমান ধারায় তাঁর দৃষ্টিপটে ভেসে

আসছিল, আঘাত হানছিল তাঁর হৃদয়ের রুদ্ধ কপাটে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে প্রখর মেধা, অসাধারণ বিচক্ষণতা এবং অনুপম স্মৃতিশক্তি দান করেছিলেন। উপরন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁকে যুগ শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত মাওলানা কাসেম নানতুভী (রহঃ) এর মত পরশ পাথরের সংস্পর্শ লাভেরও সুযোগ করে দিয়েছিলেন। যাঁর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়ে, পূর্ণিমার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের অদম্য প্রেরণা নিয়ে মাওলানা মাহমূদুল হাসান (রহঃ) দেওবন্দ থেকে বের হলেন। জিহাদের অদম্য তামান্না নিয়ে হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (রহঃ) যখন দেওবন্দ থেকে যাত্রা করেন তখন তাঁর মন-মস্তিষ্ক ছি জিহাদী জযবার এক জ্বলন্ত আগ্নেয়গীরি। তখন বলকান এবং তোরাবলাসের রক্তক্ষয়ী ঘটনাবলী তাঁকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রেশমি রুমাল আন্দোলন পরিচালনায় দারুণভাবে উদ্বুদ্ধ করে।

শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (রহঃ) ছিলেন শাহ্ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) -এর বুপ্লবী চিন্তাধারার সংরক্ষক এবং হযরত শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) -এর দ্বীনি অনুভূতির প্রতিচ্ছবি। দেশ ও জাতির দুর্দশায় তাঁর পরম সহমর্মিতা ছিল । তিনি এক সময় দারুল

উলূম দেওবন্দের মহাপরিচালক ছিলেন। তখনই তিনি আন্দোলন পরিচালনার জন্য প্রাথমিকভাবে সংগঠনের সদস্য তৈরি করেন। ধীরে ধীরে তাঁর দলে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক সময় তিনি জিহাদের জন্য সর্বোতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অবশেষে তিনি "রেশমি রুমাল আন্দোলন" -এর ভিত্তি রাখেন। প্রাথমিক পর্যায়ে হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (রহঃ) তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্র মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্দী (রহঃ) কে আন্দোলনের সদস্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাবুল পাঠান।

ওদিকে তিনি তাঁর ছাত্রদের মাধ্যমে দেশের প্রায় সকল এলাকায় একটা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন। এই নেটওয়ার্কের আওতায় তিনি বিভিন্ন স্থানে এই আন্দোলনের গোপন কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকেন।

খদ্দরের পোশাক পরিহিত শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (রহঃ) ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান, জ্ঞানী এবং একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ। তিনি হিন্দুস্তানের সর্বত্র ইংরেজ বিরোধী জনমত প্রতিষ্ঠার কাজটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আঞ্জাম দেন। তিনি নিজেই ইসলামী নেতৃত্ব দেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, দেওবন্দের ভিত্তি স্থাপনই হয়েছে ১৮৫৭ সালের যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের জন্য।

তিনি রহিমইয়ার খান জেলার দ্বীনপুর, আম্রুট শরীফ, পীরজন্ডা এবং জেহলাম জেলায় মোট পাঁচটি গোপন ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করেন। সেসব ঘাঁটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে একজন করে সেক্রেটারী নিযুক্ত করেন। ইয়ামানিস্তানের স্বাধীন অঞ্চলকে সৈন্যদের সশস্ত্র ট্রেনিং এর জন্য নির্ধারণ করেনন। ভারতবর্ষের রাজনীতির ইতিহাসে এই সময়টা ছিল অত্যন্ত বিপদসংকুল। এর প্রতিটি পদক্ষেপেই রাশি রাশি বিপদের প্রবল আশংকা ছিল। তখন নিজেদের আভ্যন্তরীণ গোপন পরামর্শের পরও কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পারিপার্শ্বিক পরিবেশে এই বিষাক্ত হাওয়া চারদিক থেকে গোটা কর্মসূচীকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

মাত্র কিছুদিন পূর্বে ১৪ হাজার আলেমকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছে। অনেককে অথৈ সমুদ্রের অতল গহ্বরে চিরদিনের জন্য ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে। অনেক আলেমকে বন্দিশালার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করে অগ্নিদগ্ধ টকটকে লাল তাম্র কাঠি দিয়ে দাগ দেয়া হয়েছে। নির্যাতন-নিপীড়নের এসব বন্ধুর গিরি পথ পাড়ি দিয়ে নিস্পেষিত বনি আদমের ত্রাহি-ত্রাহি আত্মা দুঃসহ জীবন অতিক্রম করছিল। কিন্তু শত নির্যাতনের পরও ইংরেজ শাসক সেই বৃটিশ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে মুখ খোলার মত সাহস তো দূরের কথা; তাদের

বিরুদ্ধে কিছু বলার চিন্তাটুকু করার মত সৎসাহসও কেউ করত না। সবাই সব সময় নিজের জীবন নিয়েই উৎকণ্ঠিত থাকত। সবার মনে সব সময় এসব প্রশ্ন উঁকি দিত যে, কে এই বন্ধাত্ব দূর করবে? কে এই নিষ্ক্রিয়তার অবসান ঘটাবে? কে এই স্তিমিত আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত করবে? এসব প্রশ্ন হতাশ করছিলো সকলকে।

ইত্যবসরে লোকেরা অবাক বিস্ময়ে দেখলো দারুল উলূম দেওবন্দর হাদীস শাস্ত্রের একজন স্বনামধন্য উস্তাদ মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে এ হতাশ পরিবেশের আমূল পরিবর্তন সাধনের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছেন।

তাঁর এই জগতজোড়া আন্দোলনের উদ্দেশ্য
কি ছিল তা আমরা বৃটিশ রিপোর্টের মাধ্যমে জানতে পারি। এই রিপোর্টের উদ্ধৃতি হল এমন "দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মাওলানা মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী উবাইদুল্লাহ সিন্ধী নামক তার এক নও মুসলিম ছাত্রকে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রেরণ করেন। এবং তিনি নিজে হিন্দুস্তানের অভ্যন্তরে গোপন কেন্দ্র গড়ে তোলেন। তার সেই ছাত্র উবাইদুল্লাহ সিন্ধী আফগনিস্তান থেকে ইস্তাম্বুল, সেখান থেকে তুরস্ক হয়ে রাশিয়া এবং চীনে যান। সব জায়গাতেই তিনি সর্ব সাধারণকে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে

ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। তার এই প্রাণপণ প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে দেশের ভেতরের এবং বাইরের শক্তিসমূহের সাহায্য যেন এক সময় যুগপৎ ভাবে বিদ্রোহ শুরু করা যায়।

এদিকে শাইখুল হিন্দ মাহমূদুল হাসান (রহঃ) অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আরব সফর করেন, সেখানে তিনি মদীনার তৎকালীন গভর্নর গালেব পাশা এবং আনোয়ার পাশার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। তারা তুরস্কসহ কয়েকটি রাষ্ট্রে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে চিঠি পাঠান। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল ঘটনাটি খুব দ্রুত ফাঁস হয়ে যায়।

ওদিকে শাইখুল হিন্দ (রহঃ) সেই পত্রটির একটি কপি মাওলানা খলীল আহমদ (রহঃ) -এর মাধ্যমে হিন্দুস্তান পাঠিয়ে দেন। যেহেতু ঘটনাটি আগেই ফাঁস হয়ে গেছে, তাই চিঠি খানা হিন্দুস্তান প্রদেশের পূর্বেই তার পথ রোধ করে ইংরেজ সরকার বোম্বাই নৌবন্দরে হাজার হাজার পুলিশ মোতায়ন করে। তারা আগত প্রত্যেক যাত্রীর মালামাল চেক করে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কুদরত দিয়ে চিঠিখানা তাদের হাত থেকে রক্ষা করেন। অতঃপর পত্রটি বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে কপি তৈরি করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। যখন দিল্লীর একটি প্রসিদ্ধ ফটোগ্রাফারের দোকানে এর কপি তৈরীর জন্য

কাজ চলছিল তখন সেখানে অভিযান চালানো সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে তা সংরক্ষিতই থেকে যায়।

পরিশেষে যখন দূত চিঠিখানা নিয়ে উড়োজাহাজে ওঠে তখন বৃটিশ বেনিয়াদের গোয়েন্দারা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সংবাদ পাঠায় যে, যদি আজকের ফ্লাইট চলে যায় তাহলে আগামী দিনের এই সময়ের মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য হয়ে পড়বে। সংবাদ পেয়ে তড়িৎ সিদ্ধান্ত নেয়া হল। উড্ডয়ন রোধ করে প্লেন আটকিয়ে চিঠিটি উদ্ধার করা হয়।

অন্যদিকে আন্দোলনের প্রধান অধিনায়ক শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (রহঃ) কে মক্কা থেকে গ্রেফতার করে তাৎক্ষণিকভাবে জেদ্দার রাস্তায় কায়রো পাঠানো হয়। সেখানের আদালতে তার যবানবন্দী গ্রহণ করে তাঁকে মাল্টায় নযর বন্দী রাখা হয়।

হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (রহঃ) -
এর এই আন্দোলনই "রেশমী রুমাল আন্দোলন" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই খ্যাতির কারণে, এই আন্দোলনে একজনের বার্তা অন্যজনের নিকট পৌঁছানোর কৌশল হিসেবে বার্তাটিকে রেশমী রুমালের উপর অঙ্কন করে রুমালটি পাঠিয়ে দেয়া হত। তার মধ্যে লেখা উহ্য থাকতো। আপাত দৃষ্টিতে কোন লেখা আছে

বলে মনে হত না। প্রাপক রুমালটি পেয়ে পানিতে ভিজিয়ে সূর্যের আলোতে ধরলেই লেখা ভেসে উঠতো এবং সে চিঠির মর্ম উপলদ্ধি করে নিত।

আজ আমাদের বিলাসী মন-মানসিকতার লোকদের জন্য গভীর চিন্তার বিষয় যে, মুজাহিদগণ কিভাবে নিজেদের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে আযাদী আন্দোলনের বৃক্ষে পানি সিঞ্চনের কাজ করেছেন! স্বৈরাচারী, অভিশপ্ত ইংরেজরা আযাদী সংগ্রামের প্রধান অধিনায়ক শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (রহঃ) কে তাঁর চার সাথীসহ খৃষ্টানদের প্রসিদ্ধ দ্বীপ মাল্টায় বন্দী করে রাখে। সেখানে তিনি তাঁর জীবনের বিরাট একটি অংশ দুঃসহ অবস্থায় অতিক্রম করেন। বন্দীদশার শত কষ্ট-ক্লেশকে চির ম্লান করে দিয়ে সেখানে বসেই শাইখুল হিন্দ (রহঃ) মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের একটি ঐতিহাসিক তাফ্সীর রচনা করেন। শাইখুল হিন্দ (রহঃ) কে যে কারাগারে রাখা হয়েছিল, সেখানে গোটা পৃথিবীর বড় বড় ইংরেজ বিরোধীদেরকে বন্দী করে রাখা হত । তারা সকলেই হযেত শাইখুল হিন্দ (রহঃ) -এর জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাই তারা এই বন্দীকালীন সময়টাকে সুযোগ মনে করে সকাল-সন্ধ্যা শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (রহঃ) -এর সংশ্রবে বসে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করে

তাঁর কাছ থেকে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য শুনে উপকৃত হতেন।

ওদিকে চলমান আন্দোলনের পুরোধা শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (রহঃ) কে গ্রেফতারের প্রতিবাদ এবং তাঁকে মুক্ত করার আন্দোলন হিন্দুস্তানে প্রবল হয়ে ওঠে। বেগবান হয় আন্দোলনের গতিধারা। পরিশেষে টানা চার বৎসর বন্দীজীবন কাটানোর পর ১৯১৯ সালে তিনি মুক্তি লাভ করেন। দীর্ঘ এবং দুঃসহ এই কারাভোগের ফলে চরম দুর্বলতা এবং অক্ষমতা শাইখুল হিন্দ (রহঃ) কে গ্রাস করে ফেলে। ফলে চলা-ফেরায় তিনি অনেকটা অসমর্থ হয়ে পড়েন। মাল্টা থেকে দেশে আসার সময় শাইখুল হিন্দ (রহঃ) কে বহনকারী জাহাজটি যখন বোম্বাই নৌ-বন্দরে পৌঁছে তখন যে দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিলো; তা ছিল সত্যিই অপূর্ব, অব্যক্ত এবং চির স্মরণীয়। সে দিন গোটা ভারতবর্ষের এমন কোন রাজনীতিক বাকী ছিলেন না যিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের এই অন্যতম বীর সিপাহসালারকে দেখার জন্য বন্দর পানে ছুটে আসেননি। মুক্তি-পাগল লাখো জনতার ঢল সেদিন বোম্বাই নৌ-বন্দরের সকল কার্যক্রম স্থবির করে দিয়েছিল। শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (রহঃ) কে এক নজর দেখাই ছিল সেদিন সকলের একমাত্র বাসনা। বোম্বাই থেকে দিল্লী হয়ে দেওবন্দ পর্যন্ত অর্থাৎ তাঁর সে দিনের গন্তব্যে পৌঁছার

পথের প্রতিটি স্টেশনেই স্বাধীনতা প্রিয় লাখো মুসলিম জনতার উপচে পড়া ভীড় ছিল সত্যিই দেখার মত।

মুক্তি লাভের কিছুদিন পর হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ) অসুস্থতার কোলে ঢলে পড়েন। তখন তিনি দিল্লীতে তাঁর স্বাধীনতা আন্দোলনের ত্যাগী নেতা হাকীম আজমল খানের চিকিৎসালয়ে ডাক্তার আনছারীর বাড়ীতে চিকিৎসাধীন থাকেন। এই অসুস্থতার মাঝেই শয্যাশায়ী অবস্থায় একবার তিনি আলীগড় ইউনিভার্সিটির এক বিশাল সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন। তখন আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহঃ) তাঁর পক্ষ থেকে যে ভাষণ পাঠ করেন তা ছিল রীতিমত আশ্চর্যজনক এবং বিরল প্রমাণাদী সম্বলিত। যার প্রতিটি অক্ষরেই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি চরম ঘৃণা, অবজ্ঞা ও বিদ্বেষের অপূর্ব চিত্র ফুটে উঠে।

হিন্দুস্তানের আকাশে উদিত জগৎ উদ্ভাসিক এই খ্যাতিমান সূর্য দীর্ঘ দিন আলো বিচ্ছুরণের পর পরিশেষে ২১ নভেম্বর ১৯২০ সালে ভূ-পৃষ্ঠকে আঁধার করে, সকলকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে চিরদিনের জন্য অস্তমিত হয়ে যায়। মৃত্যুর পর তাঁর লাশ আলীগড় থেকে দেওবন্দ নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

মুফ্তী এন্তেজামুল্লাহ শিহাবী (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ علماء حق اور انکی مظلومیت کی داستان 'উলামায়ে হক এবং তাঁদের উপর নির্যাতনের লোমহর্ষক বর্ণনা' নামক গ্রন্থে একটি মর্মান্তিক ঘটনার বর্ণনা দেন। তিনি লেখেন - শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (রহঃ) -এর পবিত্র মৃত দেহ গোসল দেয়ার সময় যখন উপুর করা হয় তখন উপস্থিত সকলে শিহরিত হয়ে উঠেন। তারা লক্ষ্য করেন যে, তাঁর কোমরে হাড্ডি ছাড়া আর কিছুই নেই। এ ব্যাপারে তাঁর প্রিয় ছাত্র এবং কারা জীবনের সাথী হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, মাল্টার কারাগারে বন্দী অবস্থায় শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (রহঃ) কে প্রত্যহ সকাল-বিকাল একটি ছোট্ট কক্ষে নিয়ে যাওয়া হত। সেখানে তাঁকে উপুড় করে শুইয়ে উত্তপ্ত লাল টকটকে লোহা তাঁর কোমরে চেপে ধরা হত এবং ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অকুতোভয় অবস্থান থেকে ফিরে আসার জন্য তাঁকে চরম শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হত। কিন্তু শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ) সব সময়ই এমন উত্তর দিতেন যে, স্বয়ং অত্যাচারীদের চোখও অশ্রু সজল হয়ে যেত। এভাবে শত প্রলোভন ও অকথ্য নির্যাতন চালিয়েও যখন তারা হযরতকে এক বিন্দুও টলাতে পারেনি এবং পারার আশাও করতে

পারেনি। তখন তারা তাদের এই অমানবিক নির্যাতন থেকে বিরত থাকে।

হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) বলেন, আমার উস্তাদ আমাকে শপথ করিয়ে বলেছিলেন, আমি যেন তাঁর জীবদ্দশায় বন্দী জীবনের এসব অমানবিক অত্যাচারের তথ্য প্রকাশ না করি। আজ তিনি ধরা-ধামে নেই তিনি আজ তাঁর প্রিয় মনিবের অতিথি হয়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়েছেন। তাই আজ আমি কথাগুলো আপনাদের সামনে নিঃসংকোচে প্রকাশ করছি।

শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (রহঃ) দীর্ঘ দিন যাবত দারুল উলূম দেওবন্দে হাদীসে নববীর দরস দেন। তিনি মহা গ্রন্থ আল-কুরআনের অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য একটি তরজমা লেখেন। যা পরবর্তীতে তাফসীরে উসমানী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি আরবী সাহিত্যের অলংকার শাস্ত্রের অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য কিতাব "মুখতাসারুল মাআনীর" আরবী টীকা সংযোজন করেন। এছাড়াও তিনি ছোট-বড় অনেক গ্রন্থ রচনা করে জাতিকে উপহার দিয়ে যান।

তাঁর জ্ঞানদীপ্ত শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণ করে এমন অনেক মহা মনীষী তৈরী হয়েছেন; যাঁদের দৃষ্টান্ত পেশ করতে গোটা ইসলামী জগৎ আজো সক্ষম হয়নি। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ক'জন হলেন -

১. হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)।

২. দাওয়াত ও তাবলীগ জামা'আতের রূপকার ও পুরোধা হযরত মাওলানা ইলিয়াস কান্ধলভী (রহঃ)।

৩. ইসলামী বিপ্লবের অন্যতম শীর্ষ নেতা, অকুতোভয় সিপাহসালার হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী (রহঃ)।

৪. যুগ শ্রেষ্ঠ আলেম, অনুপম স্মৃতিশক্তির অধিকারী আল্লামা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (রহঃ)।

৫. মুক্তির দিশারী শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ)।

৬. বিশিষ্ট ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদ মুফ্তী কেফায়েতুল্লাহ দেহলভী (রহঃ)।

৭. শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহঃ) প্রমুখ

এঁরা সেসব ব্যক্তিত্ব যাঁদের জ্ঞান, মহানুভবতা, উদারতা, খোদাভীতি, পরহেযগারী, বীরত্ব, রাজনীতি, দাওয়াত, তালীম, জিহাদ ও রচনার বিষয়ে শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলই তাঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

আমি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সফর করেছি। সর্বত্রই বলিষ্ঠ কণ্ঠে মুক্তির শ্লোগান দিয়েছি। পাহাড়-পর্বত, গুহা, মাঠ, জঙ্গল, নদী-সাগর এক কথায় সর্বত্রই জীবনের বিস্বাদ ও তিক্ত রাত্রি যাপন করেছি। তুরস্ক, আফগানিস্তান, রাশিয়া, চীন ও হেজায যেখানেই গিয়েছি সেখানেই মুসলমানদের উপর ইংরেজ ইহুদী-খৃষ্টান অমুসলিম পশুদের পৈশাচিক নির্যাতনের চিত্র দেখেছি।

আমার চিন্তা, শক্তি আহত, আমার কলিজা রক্তাক্ত, আমার চিন্তা-চেতনা বিপর্যস্ত, কাজেই আমি কোথা হতে আযাদী দুষ্প্রাপ্ত সম্পদ তোমাদেরকে দিবো।

তোমরা আমাকে আমার অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। মুনাফিক, প্রতারক ও ধূর্তরা আমার শাইখুল হিন্দ (রহঃ) -এর এই আন্তর্জাতিক আন্দোলনকে নস্যাৎ করে দিয়ে জাতিকে একটি সময়ের জন্য দাসত্বের জিঞ্জির পরিয়ে দিয়েছে। যা আমার অস্তিত্বের ক্রন্দন এবং আহাজারির নমুনা হয়ে রয়েছে। কোন মানুষের প্রতি আমার আকর্ষণ নেই। কোন আহার্য আমার ভাল লাগে না। কোন কিছুতেই আমি শান্তি পাচ্ছি না। তারা আমার দেহ-মনকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে আমাকে যেন জন মানবহীন প্রান্তরে ছেড়ে দিয়েছে।

-মৃত্যুশয্যায় মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী (রহঃ) -এর উক্তি

বিপ্লবী ইমাম

হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী (রহঃ) জন্ম: ১৮৭২ ঈসায়ী - মৃত্যু: ১৯৪৪ ঈসায়ী

মোটা পাঞ্জাবী, খদ্দরের পায়জামা, খালি পা, খালি মাথা, এলোমেলো চুল ও তিক্ত জীবন অতিক্রমে অতিষ্ঠ এক ব্যক্তি নির্বাসিত জীবনের সুদীর্ঘ কাল পেরিয়ে এসে দিল্লীর রেল স্টেশনে গাড়ি থেকে থেকে নামলেন।

আজ থেকে ২৬ বছর পূর্বে এ লোকটির উজ্জ্বল চেহারায় শ্মশ্রুগুলো তাজা ফলের ন্যায় শোভা পাচ্ছিলো। কিন্তু আজ তা বার্ধক্যের এক করুণ প্রতিচ্ছবি। এ যেন কাউকে রাশি রাশি বিপদাপদের অকুল-অতল-অথৈ সাগরে নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং সুদীর্ঘ কাল পর যখন তাকে সেখান থেকে উঠানো হয়েছে তখন তিনি বিপদাপদের ক্রমাগমন এবং সাহচর্যকে নিজের অস্তিত্বের সাথে একীভূত করে নিয়েছেন।

তাঁর শুভাগমনে আজ সমস্ত হিন্দুস্তানবাসী দিল্লীর রেল স্টেশনে সমবেত। জনগণের এই সম্মিলিত উপস্থিতি তাঁর দেশ প্রেমের মহা প্রমাণ ও শত্রু সাম্রাজ্যের প্রতি বিদায়ী বার্তারই প্রতিবিম্ব। তাঁর প্রতি আপামর জনসাধারণের অপরিসীম ভক্তি ও অকৃত্রিম ভালবাসার ফুল কেবল পাপড়ি মেলে ছিল। হঠাৎ শ্লোগানের ধ্বনি প্রতিধ্বনিকে ম্লান করে দিয়ে একটি জোরালো আওয়াজ ধ্বনিত হল। "তোমরা আমার অভ্যর্থনায় কেন এসেছ? তোমরা

কি ইংরেজদেরকে রাজ্য থেকে তাড়িয়েছো? চলে যাও। আজও আমি দুঃখ-বেদনায় পরিশ্রান্ত-ক্লান্ত-অবসন্ন। যতদিন না এদেশ থেকে ইংরেজদের আধিপত্য সমূলে উৎখাত হচ্ছে, ততদিন আমার জান-প্রাণ শোকার্ত থাকবে।" এই বজ্র হুংকার ছেড়ে ছিলেন আজকের আগত সম্মানিত অতিথি হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী (রহঃ) যাঁকে এক নযর দেখার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামে ও আযাদী আন্দোলনের সকল কর্মীরা আজ এখানে সমবেত হয়েছেন।

হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী (রহঃ) শিয়ালকোট জেলার এক শিখ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৮৪ সালে হযরত শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) প্রণীত গ্রন্থ 'তুহফাতুল হিন্দ' তথা হিন্দুস্তানের উপহার নামক বইটি পড়ে প্রভাবিত হন। আর এই সূত্র ধরে তিনি ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে আশ্রয় নেন। পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার কারণে তিনি প্রথমে তাঁর ইসলামে প্রবেশের সংবাদ গোপন রাখেন। দু'বছর পর তিনি এ সংবাদ প্রকাশ করেন। এরপর সিন্ধের বিখ্যাত আধ্যাত্মিক রাহবার সায়্যিদুল আরেফীন হযরত হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদ সিদ্দীক ভরজুন্ডীর খেদমতে গমন করেন। সেখানে তিনি ইসলাম গ্রহণের চার বৎসর অতিক্রান্ত না হতেই তিনি জগদ্বিখ্যাত আধ্যাত্মিক ও বিপ্লবী এলাকা রহিমইয়ার খানের দ্বীনপুর

গ্রামে প্রস্থান করেন। সেখানে হযরত উবাইদুল্লাহ সিন্ধী (রহঃ) তৎকালীন সবচেয়ে শীর্ষস্থানীয় আলেম খাজা গোলাম মুহাম্মাদ সাহেব দ্বীনপুরীর কাছ থেকে দ্বীনি কিতাবাদীর শিক্ষা গ্রহণ শুরু করেন। এরপর মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী (রহঃ) ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে দেওবন্দ পৌঁছে শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (রহঃ) -এর নিকট হাদীসের শিক্ষা সমাপন করেন। মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী (রহঃ) প্রায়ই বলতেন-'শাইখুল হিন্দের সাক্ষাৎ লাভের পর কয়েক দিনের মধ্যেই আমার মন-মস্তিষ্কে আন্দোলনের চিন্তা-চেতনা ব্যাপকভাবে নাড়া দেয়। আর এতে সবচেয়ে বেশী কার্যকর ভূমিকা পালন করে হযরত শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) -এর জীবনী গ্রন্থ পাঠের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশী।

হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী (রহঃ) অভূতপূর্ব মেধা এবং অতুলনীয় স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। দিল্লীর প্রসিদ্ধ দৈনিক 'ইত্তেহাদের' ১৬ মার্চ ১৯৩৮ ইং সংখ্যার 'পরাধীনতার জিন্দেগী' পাতায় মাওলানা সিন্ধী অসাধারণ ধীশক্তির বিবরণ দিয়ে লেখা হয় যে, 'রেশমী রুমাল আন্দোলনের জন্য মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী (রহঃ) বিভিন্ন রাষ্ট্র সফর করেন। এ সকল দেশে পৌঁছে এক রাতেই তিনি ঐ দেশের ভাষা শিখে নিতেন এবং পরদিন সে ভাষায়ই নিজে

প্রোগ্রাম পেশ করতেন।" স্বয়ং তার উস্তাদ শাইখুল হিন্দ (রহঃ) বলেন, আমি উবাইদুল্লাহ সিন্ধী ও আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরীর ন্যায় মেধাবী ছাত্র আর দেখিনি এবং এমন ধীমান ছাত্রের অস্তিত্বের কথাও কারো কাছে শুনিনি।

মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী (রহঃ) শুরু থেকেই ইংরেজ শাসনের প্রতি চরম ঘৃণা পোষণ করতেন। তাই তিনি শিক্ষা জীবন সমাপ্তির তের বৎসর পর সিন্ধের পীরঝাণ্ডা নামক এলাকায় ইসলামের একটি বিশাল প্রচার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। মাওলানা সিন্ধী (রহঃ) ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (রহঃ) -এর নির্দেশে দারুল উলূম দেওবন্দে যুব সমাজের বিপ্লবী ও রাজনৈতিক পার্টি 'জামিয়াতুল আনসারের' গোড়া পত্তন করেন। এভাবে তিনি গোপনে স্বেচ্ছাসেবকদের সার্বিক তত্বাবধানের কাজও আঞ্জাম দেন। তিনি এমন একটি প্রতিকূল সময়ে এসব করেছেন যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে বড় বড় এবং স্বনামধন্য ব্যক্তিদেরও সাহস হত না। কলিজা আঁতকে উঠত। হৃদকম্পন শুরু হয়ে যেত। যেহেতু তখন নিপীড়িত মানবতার বুক ফাটা আর্তি ছিল বিশ্বব্যাপী এক অদম্য আন্দোলন ও নির্ভীক সংগ্রাম চালিয়ে গোটা এশিয়ার বুক থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের চির অবসান ঘটানো।

এই প্রেক্ষাপটেই শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসাব (রহঃ) রেশমী রুমাল আন্দোলনের সূচনা করেন। এই আন্দোলনে তিনি হযরত উবাইদুল্লাহ সিন্ধী (রহঃ) -কে সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত করেন। কাজের ধারাবাহিকতায় ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে রেশমী রুমাল আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তায় তিনি আফগানিস্তান সফর করেন। এই সুবাদে বৃটিশ সরকার তাঁকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য নির্বাসনের ঘোষণা দেয়। এ সময় তিনি আমীর হাবীবুল্লাহ খানের সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় করেন এবং আমীর আমানুল্লাহ খান -এর সাথে একাত্ম হয়ে কাবুলে রেশমী রুমাল আন্দোলনের সেচ্ছাসেবক বাহিনী ভর্তির কাজে নিয়োজিত হন।

এরপর তিনি তুরস্কের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। বেশ কিছুকাল তিনি সেখানে কাটান। ইত্যবসরে তিনি সেখানকার বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইসলামের নানা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তিনি রাশিয়া সফরকালে বড় বড় রুশ নেতাদের সাথে এশিয়ার স্বাধীনতা ও চলমান স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা, রূপরেখা ও বাস্তবতা নিয়েও আলোচনা করেন। তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী (রহঃ) জার্মান সফর করেন। সেখানে তিনি দীর্ঘকাল পর্যন্ত আন্দোলনের সদস্য তৈরি করতে থাকেন। এদিকে আন্দোলনের গোপনিয়তা ফাঁস

হয়ে যায়। ফলে আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (রহঃ) কে গ্রেফতার করে মাল্টায় নযরবন্দী করে রাখা হয়। মাল্টায় সুদীর্ঘ বন্দী জীবন যাপনের পর তিনি মুক্তি লাভ করেন। মুক্তি লাভের প্রায় দশ বৎসর পর যখন তাঁর ইন্তেকাল হয় তখন নির্বাসিত বিপ্লবী নেতা মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী (রহঃ) দেশে ফেরার অনুমতি পান।

নির্বাসনের পর তিনি কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। যার মধ্যে 'এলহামুর রহমান' একটি উঁচুমানের তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই তাফসীরে তিনি জাতির কাছে ইসলামের বিপ্লবী ও জিহাদী আহ্বান নতুন আঙ্গিকে পেশ করেন।

জগদ্বিখ্যাত এই মহা মনীষী জীবনের সুবিশাল পরিক্রমা পেরিয়ে পরিশেষে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবের দ্বীনপুরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

সাইয়্যেদ মুহাম্মদ দাঊদ গজ্নভী (রহঃ) -এর নিকট খুঁটিনাটি মাসআলার ও মতানৈক্যের কোনই গুরুত্ব ছিল না। তাঁর নিকট সবচেয়ে গুরুত্বের বিষয় ছিল মুসলিম জাতিকে ইংরেজদের গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্ত করা। এ বৃহৎ লক্ষ্যে তিনি জীবনের বড় বড় বহু বিপদ ও কষ্ট-ক্লেশ বরদাশত করেছেন।

-মাওলানা ফারুকী (রহঃ)

আযাদী আন্দোলনের খ্যাতনামা পথ প্রদর্শক,

ইখলাস ও আমলের প্রতিচ্ছবি হযরত মাওলানা

সাইয়্যেদ মুহাম্মদ দাঊদ গজ্নভী (রহঃ)

অভূতপূর্ব সুন্দর মুখশ্রী, সুঠাম দেহ, নন্দিত সৌন্দর্য, শোভাময় পরিষ্কার ও কৌলীণ্যে উদ্ভাসিত মুখাবয়বে সুসজ্জিত সাইয়্যেদ মুহাম্মদ দাঊদ গাজনভী (রহঃ) উপমহাদেশের এক উচ্চ-শিক্ষিত পরিবারের নয়ন মনি ও দীপ্ত প্রদীপ। তাঁর পিতা হযরত মাওলানা আব্দুল জাব্বার গজনভী (রহঃ) ছিলেন সমসাময়িক কালের উঁচুমানের ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি গজনী থেকে

হিজরত করে অমৃতসরে এসে বসবাস আরম্ভ করেন। মাওলানা দাঊদ গজনভী (রহঃ) দীর্ঘ শিক্ষা জীবনে ছরফ, নাহু ও তাফসীরের গ্রন্থাবলী স্বীয় পিতার নিকট, ফিকাহ, উসূলে ফিকাহ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ গাজীপুরীর নিকট এবং যুক্তিবিদ্যা মাওলানা সাইফুর রহমান কাবুলীর নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষা জীবন সমাপ্তির পর অমৃতসরের মাদ্রাসায়ে গজনভীতে তিনি অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে জুলয়ানা ওয়ালার (একটা জায়গার নাম) রক্তাক্ত দাঙ্গা তাঁর মন-মস্তিষ্কে গভীর প্রভাব ফেলে। ফলে তাঁর অনুভূতির নিভৃত কুটিরে জেগে ওঠে স্বাধীনতার অদম্য স্পৃহা। এরই সূত্র ধরে তিনি পদার্পণ করেন রাজনৈতিক জীবনে। ক্ষণকালের ব্যবধানেই সাইয়্যেদ দাঊদ গজনভী (রহঃ) উপমহাদেশের শীর্ষ পর্যায়ের মুজাহিদদের কাতারে পরিগণিত হয়ে থাকেন। তখন তিনি ছিলেন এক দিকে জ্ঞানে- গুণে যুগের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। অন্য দিকে দুঃসাহসিকতা, দৃঢ়তা ও ধৈর্য্যের সুমহান প্রতিচ্ছবি। তিনি অক্লান্ত মুজাহিদ ও নির্ভীক নেতা হিসেবে হিন্দুস্তানের দল-মত নির্বিশেষে সকলের প্রিয় ও আস্তাভাজন ছিলেন। ওদিকে তিনি ছিলেন আহলে হাদীস মতাদর্শের অনুসারী। এই অঙ্গনে তাঁর ঈর্ষনীয় খ্যাতি এবং ব্যক্তিত্ব ছিল। রাজনৈতিক অঙ্গনে তিনি আমীরে শরীয়ত সাইয়্যেদ আতাউল্লাহ শাহ্

বুখারীর নেতৃত্বে কাজ শুরু করেন। তিনি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে জ্ঞান, প্রতিভা ও বুদ্ধির প্রশস্ততা, উত্তম চরিত্র এবং উন্নত কীর্তির এক বিরাট ভাণ্ডার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। পরাধীনতার শৃঙ্খলাবদ্ধ ভারত জাতিকে স্বাধীনতা এনে দেয়ার চেষ্টায় তিনি সদা অস্থির থাকতেন। তাঁর নিকট খুঁটিনাটি মাসআলার মতানৈক্যের কোন গুরুত্ব ছিলনা। তাঁর নিকট সবচেয়ে গুরুত্বের বিষয় ছিল মুসলিম জাতিকে ইংরেজদের গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্ত করা। এ বৃহৎ লক্ষ্যে তিনি জীবনে বড় বড় বহু বিপদ ও কষ্ট-ক্লেশ বরদাশত করেছেন।

হযরত আতাউল্লাহ শাহ্ বুখারীর সাহচর্য তার ব্যক্তিত্বে এমন ঔজ্জ্বল্য ও প্রদীপ্তি সৃষ্টি করেছিলেন যে, মুসলমানদের সকল শ্রেণীই তাঁকে তাদের পথ প্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করত। তিনি এ কালে হযরত শাহ্ আতাউল্লাহ বুখারী (রহঃ) -এর প্রতিষ্ঠিত 'মজলিসে ইহরারুল ইসলাম' এর মহাসচিব হিসেবেও একটি সময় পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। এমনিভাবে তিনি রাজনৈতিক অঙ্গনে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সহ-সভাপতি এবং এক সময় কংগ্রেসের পাঞ্জাব প্রদেশের সভাপতিও ছিলেন। কিন্তু মজলিসে ইহরারের সাথে তাঁর যে সুসম্পর্ক ও অন্তরঙ্গতা ছিল তা অন্য কোন দলের ভাগ্যে জুটেনি।

এ থেকেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের অনুমান
করা যায় যে, তিনি যৌবনে ইংরেজ বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ১২ বছর ইংরেজদের জেলে অন্তরীণ ছিলেন। শাইখুল ইসলাম সাইয়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ), মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (রহঃ), আল্লামা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (রহঃ), মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী (রহঃ), সাইয়্যেদ আতাউল্লাহ শাহ্ বোখারী (রহঃ), মাওলানা জাফর আলী খা (রহঃ), হাকিম আজমল খা, ডাঃ মুখতার ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ও মুফ্তী মুহাম্মাদ হাসান (রহঃ) প্রমূখ মনীষীদের ন্যায় তৎকালীন হিন্দুস্তানের শীর্ষস্থানীয় মহাপুরুষদের সঙ্গে তিনি আযাদীর জন্য সর্বাত্মক সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন। এরই প্রেক্ষিতে বেশ কয়েক বৎসর তিনি এ সমস্ত আকাবিরদের সঙ্গে কারাগারেও কালাতিপাত করেন।

অবশেষে এক পর্যায়ে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করলেন। মুসলিম লীগে তাঁর এই যোগদানকে সর্ব প্রথম সবচেয়ে বেশী বড় করে ফলাও করে প্রকাশ করে মাওলানা জাফর আলী খা কর্তৃক পরিচালিত 'দৈনিক জমিনদার' পত্রিকা।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ দাঊদ গজনভী (রহঃ) দলাদলিমূলক মনোবৃত্তির অনেক

উর্ধ্বে ছিলেন। তাঁর সামনে উপমহাদেশের আযাদী সর্বাধিক গুরুত্ব ও বুনিয়াদী ছিল একটা দৃষ্টান্তমূলক পর্যায়ে। দেশ বিভক্তির পর তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারের মেম্বার নির্বাচিত হন। তখনও তিনি বৃটিশ আইনের বিরুদ্ধে জোরালো ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ১৯৫৩ সালে সকল মতের উলামায়ে কেরাম ও নেতৃবৃন্দের সম্মিলিত ২২ দফা প্রণয়নের ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সৌদি বাদশাহ তাঁকে মদীনা ইউনিভার্সিটির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য তালিকায় তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করেন।

হযরত মাওলানা দাঊদ গজনভীর পৃষ্ঠপোষকতায় ফায়সালাবাদের জামিয়া সালাফিয়ার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। তিনি "বিলায়াত" ও "রিয়াযাতের" জগতে অনেক উর্ধ্ব অধিষ্ঠিত ছিলেন । চির জীবন তিনি অপশক্তি, অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত হিন্দুস্তানের আকাশের ভাস্বর সূর্য পরিশেষে ১৯৬৩ সালের ১৬ই ডিসেম্বর সোমবার সাড়ে নয়টায় চির অস্তমিত হয়ে যায়।

মাতৃভূমির আযাদী আন্দোলনে আমি ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অংশ গ্রহণ করিনি।
আপনাদের প্রস্তাবের শোকরিয়া আদায় করছি।
তবে জেনে রাখুন! কোন প্রলোভন আমার প্রতিবাদ ধ্বনিকে স্তব্ধ করতে পারবে না।

-মুফ্তী কেফায়েতুল্লাহ্ (রহঃ)

হিন্দুস্তানের মুফ্তীয়ে আ'যম

হযরত মাওলানা মুফ্তী কেফায়েতুল্লাহ (রহঃ) জন্ম: ১৮৭৫ ঈসায়ী - মৃত্যু: ১৯৫২ ঈসায়ী

উপমহাদেশের রক্তিম ইতিহাসের পাতায় একজন বীর মুজাহিদ এবং অদ্বিতীয় ফকীহ্ এর উজ্জ্বল চেহারা বিদ্যমান। তাঁর উজ্জ্বল কীর্তি এবং অনুপম চরিত্রের দীপ্তি ইতিহাসের পত্র-পল্লবের ছত্রে ছত্রে আজও ভাস্বর হয়ে আছে । হাল্কা গড়ন, ঘন শ্মশ্রু, বিস্তৃত শীর, মাঝারি উচ্চতা, ঠান্ডা মেজায, অকৃত্রিম ও স্বল্প ভাষী, সুদর্শন চেহারা এসবের প্রলেপ দিয়েই হযরত মাওলানা মুফতী কেফায়াতুল্লাহ (রহঃ) -এর দেহ গড়া।

এসব অনুপম বৈশিষ্টাবলী যেন তাঁর গোটা দেহ জুড়ে বিচ্ছুরিত হতে থাকে প্রতিনিয়ত।

হযরত মাওলানা মুফতী কেফায়েতুল্লাহ (রহঃ) শাহজাহানপুর (রোহিলা খণ্ড, ইউ.পি.ইন্ডিয়া) এর 'যই' নামক এলাকায় ১২৯২ হিজরী সনে জন্ম গ্রহণ করেন। জন্মের মাত্র পাঁচ বৎসরের মাথায় তিনি পবিত্র কুরআনের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। এরপর সেখানেই তিনি মাওলানা ই'যায হাছান (রহঃ) -এর মাদ্রাসায়ে ই'যাযিয়ায় পর্যায়ক্রমে আরবী কিতাবাদী শিখতে শুরু করেন। ১৫ বৎসর বয়সে তিনি জ্ঞান-পিপাসা নিবারণের জন্য মুরাদাবাদের শাহী মাদ্রাসায় চলে যান। সেখানে হযরত মাওলানা আব্দুল আলী মিরাঠী (রহঃ) -এর নিকট তিনি ইলমে হাদীসের জ্ঞান অর্জন শুরু করেন। ১৮৯৭ সালে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (রহঃ) -এর নিকট এর সমাপ্তি টানেন।

ছাত্র জীবন থেকে ফারেগ হওয়ার পর হযরত মাওলানা মুফ্তী কেফায়েতুল্লাহ (রহঃ) মাওলানা দেহলভী (রহঃ) -এর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা- মাদ্রাসায়ে আইনুল উলূমে (তৎকালীন) মাত্র ১৫ টাকা বেতনে অধ্যাপনা শুরু করেন। এই ব্যস্ত সময় অতিবাহনের ফাঁকে তিনি কাদিয়ানী মতবাদ ও কাদিয়ানী ফেতনার বিরুদ্ধে "আলবুরহান" নামে একটি

মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই মাদ্রাসায় অধ্যাপনাকালে তিনি খৃষ্টান ও আরিয়া সম্প্রদায়ের সাথে ঐতিহাসিক দু'টি বিতর্ক অনুষ্ঠান করে ইসলামের সততা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে দেখান। খৃষ্টানদের সাথে তাঁর বিতর্ক অনুষ্ঠানের পর শ্রোতাদের একাংশের মন্তব্য ছিল এমন যে, দেখলে! ঐ দুর্বল, হালকা মানুষটির সিংহের মত হুংকার ছাড়ছে এবং তাঁর প্রতিটি কথায় খৃষ্টানদের ধর্ম জাযক (পাদ্রী) রীতিমত ঘর্মাক্ত হয়ে পড়ছে। তাঁর প্রতিটি কথা যেন পাদ্রীকে একের পর এক বুলেট বিদ্ধ করছে।

3

১৯০৩ সালে হযরত মাওলানা মুফ্তী কেফায়েতুল্লাহ (রহঃ) দিল্লী চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি হযরত মাওলানা আমীনুদ্দীন (রহঃ) -এর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা-মাদ্রাসায়ে আমীনিয়্যাহ এর প্রধান শিক্ষক হিসেবে মনোনীত হন। আর জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি সেই আসনটি অলংকৃত করে রাখেন। মুফ্তীয়ে আজম হযরত মাওলানা কেফায়েতুল্লাহ দেহলভী (রহঃ) সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী একজন প্রখর প্রতিভাবান আলেমে দ্বীন ছিলেন। তিনি ছিলেন অনুপম স্মৃতিশক্তি, প্রখর মেধা, এবং ক্রমবর্ধমান ইলম ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের জান্নাতী সম্পদে সম্পদশালী। মুফ্তী কেফায়েতুল্লাহ (রহঃ) ইলমী পরিপক্কতা- ও

3 সূত্র: মুফতীয়ে আযম কী ইয়াদ; পৃষ্ঠা: ১২৭

অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কারণে এত প্রসিদ্ধ ছিলেন যে , গোটা হিন্দুস্তান তাঁর সারগর্ভ ফতোয়া ও মাসআলা দান নিয়ে গর্ব করত। সর্বোতো বিচারে হিন্দুস্তানের ইতিহাসের পাতায় তিনি "হিন্দুস্তানের মুফ্‌তীয়ে আযম" হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

সমসাময়িক কালের বিরল ব্যক্তিত্ব এই মহান আলেম দ্বীনি তালীম প্রদান , দ্বীনের দাওয়াত ও প্রচার -প্রসারের পাশাপাশি ইংরেজ দুঃশাসনের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে ব্যাঘ্র হুংকার দিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুফ্‌তী কেফায়েতুল্লাহ (রহঃ) ১৯১৫ সালে রাজনীতির কন্টকাকীর্ণ ভূমিতে পদার্পণ করেন। তখন তিনি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সম্মিলিত সাধারণ সভায় যোগ দান করেন। ঐ বৈঠকে মিস্টার মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ এবং কংগ্রেসের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দও যোগদান করেন। "ميثـــاق لكهنو" স্মারক।

হযরত মাওলানা মুফ্‌তী কেফায়েতুল্লাহ (রহঃ) -এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা সম্পর্কে তাঁর উস্তাদবর্গ ; এমন কি গোটা ভারত উপমাহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণ -পুরুষ , বীর মুজাহিদ শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (রহঃ) -এর উক্তি ছিল এমন যে ,-" নিশ্চয় তোমরা রাজনীতিবিদ ,

তবে মৌলভী কেফায়েতুল্লাহ -এর মেধা, প্রজ্ঞা সবই রাজনীতিবিদ।

4

মুফ্তীয়ে কেফায়েতুল্লাহ (রহঃ) ১৯১৮ সালে বহুসংখ্যক উলামায়ে কেরাম সহ মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯১৯ সালে তিনি দিল্লীর খেলাফত কনফারেন্সে 'বৃটিশদের সন্ধি উৎসব' বয়কট করার ঐতিহাসিক প্রস্তাব পেশ করেন। যা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ঐ বৎসরই মুফ্তী কেফায়েতুল্লাহ দেহলভী (রহঃ) ভারত উপমহাদেশের সকল আলেমকে একই সূত্রে গ্রথিত করে সুশৃঙ্খলভাবে ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামের স্রোত ধারাকে তরান্বিত করার মহৎ অভিপ্রায়ে "জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ" নামক সংগঠনের গোড়াপত্তন করেন। এই সংগঠনের প্রথম বৈঠকে ২৫ জন আলেম যোগদান করেন। ঐ বৈঠকে তিনি সর্ব সম্মতিক্রমে সভাপতি মনোনীত হন। তখন থেকে একটানা ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ সুদীর্ঘ ৯ বৎসর যাবত তিনি ঐ দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আঞ্জাম দিতে সক্ষম হন।

মুফ্তী কেফায়াতুল্লাহ দেহলভী (রহঃ) ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিচালিত প্রতিটি সংগ্রামেই অংশ গ্রহণ করেন।

হযরত মাওলানা মুফ্তী কেফায়াতুল্লাহ দেহলভী (রহঃ) ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মু'তামারে

4 সূত্র: বিস বড়ে মুসলমান; পৃষ্ঠা: ১২৭

আলমে ইসলামীর ভারত প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। এই প্রতিনিধি দলটি ইসলামী জগতের সকল উলামায়ে কেরামের সব চেয়ে বড় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে।

হযরত মাওলানা মুফ্তী কেফায়াতুল্লাহ দেহলভী (রহঃ) ১৯৩০ সালের ১১ অক্টোবর ইংরেজ স্বৈর শাসকদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে প্রথম বারের মত গ্রেফতার হন। এর এক বৎসর পর গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পর যখন ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে তখন আবার তাঁকে দ্বিতীয়বারের মত গ্রেফতার করা হয়। সেই সময় তাঁকে মুলতানের কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মাওলানা হাবীবুর রহমান লুদইয়ানভী, মাওলান শাহ্ আতাউল্লাহ বুখরী এবং মাওলানা দাঊদ গজনভী সহ আরো কয়েকজন বিশিষ্ট আলেমও তাঁর সাথে কারা বরণ করেন। দুদীর্ঘ ১৮ মাসের এই অন্তরীণ জীবনে ইংরেজ স্বৈরাচারীদের হাতে তাঁকে নিদারুণ কষ্ট পোহাতে হয়।

মুফ্তী কেফায়াতুল্লাহ (রহঃ) -এর জীবনীকারের বর্ণনা অনুযায়ী মুলতানের জেলখানায় তিনি বুখারী শরীফের দরসও দিয়েছেন। বন্দীদশার এই সময়ে কিছু দিনের জন্য তাঁকে গুজরাটের জেলখানায়ও স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

জীবনীকার লেখেন, বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী মুফ্তী কেফায়াতুল্লাহ দেহলভী (রহঃ) কে সংগ্রাম থেকে বিরত রাখার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করেছে। চেষ্টায় তারা কোন রকম ত্রুটি করেনি। কিন্তু তাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তাই পরিশেষে তারা মুফ্তী কেফায়াতুল্লাহ (রহঃ) –এর নিকট এই মর্মে আবেদন পত্র প্রেরণ করে যে, "বৃটিশ সরকার এই আবেদন করছে যে, আপনি (মুফ্তী কেফায়াতুল্লাহ) রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে বিরত থাকুন। বিনিময়ে সফদর জঙ্গ মাদ্রাসার রাজকীয় অট্টালিকা এবং তৎসংলগ্ন বিশাল মাঠটি আপনাকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করা হবে।

আমাদের এই আবেদনের উদ্দেশ্য এই নয়
যে, আপনি আমাদের পক্ষে প্রচার-প্রপাগান্ডা করবেন; বরং আপনি শুধু মৌনতা অবলম্বন করলেই হবে।"

বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর প্রলোভন হযরত মুফ্তী সাহেবকে বিন্দু মাত্রও টলাতে পারেনি। তাদের দেয়া প্রলোভনের উত্তরে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন, "মাতৃভূমির আযদী আন্দোলনে আমি ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্বির জন্য অংশ গ্রহণ করিনি। আপনাদের প্রস্তাবের শোকরিয়া আদায় করছি। তবে জেনে রাখুন! কোন প্রলোভন আমার

প্রতিবাদ ধ্বনিকে স্তব্ধ করতে পারবে না"

5।

মুফ্তী কেফায়াতুল্লাহ দেহলভী (রহঃ) ১৯৩৮ সালে মিসরের মু'তামারের ফিলিস্তীনী- সম্মেলনে প্রতিনিধি দলের চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করেন। মুফ্তী কেফায়াতুল্লাহ (রহঃ) ছিলেন উঁচুমানের একজন পরহেযগার, মুত্তাক্বী ও বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন। তাঁর দরস থেকে বড় মাপের আলেম তৈরী হয়েছে। বর্তমান যুগের সর্ব মহলে সমাদৃত ও প্রসিদ্ধ কিতাব "তালীমুল ইসলাম" তাঁরই সংকলিত। এছাড়া তাঁর লেখা আরো অনেক কিতাব আছে। যা উম্মতের বিরাট সম্পদ হিসেবে কাজ করছে।

১৯৫২ সালের ২১ ডিসেম্বর রাজনীতি, আধ্যাত্মিকতা, শিক্ষা, তাসাওউফ ও জিহাদের এই মহান সূর্য জাতিকে অশ্রুসিক্ত করে চিরদিনের জন্য অস্তমিত হয়ে যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর দারাজাত বুলন্দ করুন। আমীন।

5 সূত্র: বিস বড়ে মুসলমান; পৃষ্ঠা: ১২৭

ইংরেজ সেনা বাহিনীতে যোগ দেয়া বা তাদেরকে যে কোনভাবে সাহায্য করা এবং যে কোন

[149]

প্রকারে তাদেরকে উৎসাহিত করা সবই শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম ।

- সাইয়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ)
-এর ঐতিহাসিক ফতোয়া

ইংরেজ বেনিয়াদের হীন চক্রান্তের সপ্তম পর্ব
ও
আউলাদে রাসূল (ছঃ) শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা

সাইয়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ)
জন্ম: ১২৯৬ হিজরী - মৃত্যু: ১৩৭৭ হিজরী

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের কথা। তখন ভারতের ছোট্ট একটি গ্রামে উদিত হয় সুদূর আরবের প্রত্যন্ত পর্যন্ত হেদায়েতের আলো বিচ্ছুরণকারী এবং নবী পরিবারের এক প্রদীপ্ত আলোকবর্তিকা। তাঁর সৌভাগ্যবান ললাট থেকে হেদায়েতের আলোক এবং সফলতার রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। জন্মের ১৩ বৎসরের মাথায় এই সৌভাগ্যবান বালক দারুল উলূম দেওবন্দের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেন। দারুল উলূমে যে স্থানে এই সম্ভাবনাময় বালক অবস্থান করেন সেটা শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (রহঃ) -এর অবস্থান স্থলের সাথে একেবারে সংযুক্ত। যেন তার কিয়ামগাহের সাথেই ফয়েয ও বরকতের ফোয়ারা স্থাপন করে রাখা হয়েছে।

ঐতিহাসিক বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দের তখন তিনি মাত্র ফার্সী পড়ছিলেন এক অতিবাহিত না হাতেই শাইখুল হিন্দ হযরত মাহমূদুল হাসান (রহঃ) তাঁর সবক নিজ দায়িত্বে নিয়ে নেন। এভাবেই তিনি হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ) -এর বাড়ীতে যাওয়া-আসা শুরু করেন।

ঈর্ষনীয় প্রতিভার অধিকারী এই ছেলেটিই ছিল শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ)। তিনি মাত্র ৬ বৎসরে নাহু, সরফ, ফালসাফা, মানতেক, ফিকহ, উসূল, আরবী সাহিত্য উসূলে হাদীস এবং তাফসীরের সমস্ত কিতাবাদী আত্মস্থ করে সপ্তম বর্ষে রীতিমত হযরত শাইখুল হিন্দ হাদীসের দরসে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করেন।

১৩১৪ হিজরীতে যখন তিনি শিক্ষার্জন থেকে অবসর হন তখন তাঁর সম্মানিত পিতা সাইয়্যেদ হাবীবুল্লাহ সাহেবের নির্দেশে তিনি হিজায চলে যান। হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) মদীনায় পৌঁছে মসজিদে নববীতে হাদীসের দরস দিতে শুরু করেন। এতে অতি অল্প দিনেই তিনি এক অভূতপূর্ব প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। সে সময়ে সাত-আট শ' আলেম তাঁর দরসে হাদীসে শরীক হন।

হযরত সাইয়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) দীর্ঘ ১৪ বৎসর মসজিদে নববীতে হাদীসের দরস দেন। এরপর তিনি হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ) –এর সাথে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন গ্রেফতার হয়ে মাল্টার প্রস্তরময় দ্বীপের বন্দীশালায় জীবন যাপন করেন।

অত্যাচারী ও জালিম বৃটিশ শাসকের নজরবন্দীতে হযরতের দীর্ঘ ৪ বৎসর কেটে যায়। পরিশেষে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি

মুক্তি পেয়ে হিন্দুস্তানের মাটিতে এসে পৌঁছেন। এরপর আনুমানিক ১০ বৎসর তিনি কলকাতায় হাদীসের দরস দানের খেদমত আঞ্জাম দেন। অতঃপর যখন আল্লামা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (রহঃ) দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে 'ডাভেল' চলে যান। ফলে হযরত মাদানী (রহঃ) শাইখুল হাদীস হিসেবে হযরত কাশ্মীরীর পদে আসীন হন। ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের ইলমের বাগানকে সুসজ্জিত ও পরিপাটি করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান শত্রুদের কাতারে পরিগণিত হতেন। তিনি মোট ৭ বৎসর কারাভোগ করেন এবং আজীবন ইংরেজ দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ চালিয়ে যান।

তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মামলার শোনানী করাচী আদালতের 'খালেক দীনা' হলে অনুষ্ঠিত হয়। এ মামলা পৃথিবীর অন্তিমকাল পর্যন্ত সকল স্বাধীনতাকামী এবং আন্দোলনকারীদের জন্য আদর্শ হয়ে থাকবে। এই মামলার কারণ ছিল তাঁর সেই ঐতিহাসিক ফতওয়া যা তিনি হিন্দুস্তানের ইংরেজ সৈন্যদের নামে প্রেরণ করেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন, "ইংরেজ সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়া বা তাদেরকে যে কোনভাবে সাহায্য

করা এবং যে কোন প্রকারে তাদেরকে উৎসাহিত করা সবই শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম।"

হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) -এর এই পুরুষোচিত এবং যুগোপযোগী ফতওয়া গোটা বৃটিশ প্রশাসনে তোলপাড় সৃষ্টি করে দেয় এবং গোটা ভারতবর্ষে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে ওঠার উপক্রম হয়। করাচীর আদালতে যখন তাঁর এই বিপ্লবী ফতওয়ার বিপক্ষে মামলা চলে, তখন পাঁচ শ' আলেমের উপস্থিতিতে ইংরেজ জজ হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) কে তাঁর ফতওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করতে থাকে। তখন হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) অত্যন্ত সাহসিকতা, অস্বাভাবিক বিচক্ষণতা এবং সত্যবাদীতার সাথে বলেন: "ফতওয়া যা হবার আমি তাই দিয়েছি যত দিন আমার শিরা-উপশিরায় এক ফোটা রক্তও সচল থাকবে ততদিন এর প্রচার-প্রসার এবং যথার্থ বাস্তবায়নের আহ্বান অব্যাহত থাকবে।"

মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার (উপস্থিত আলেমদের একজন) হঠাৎ হযরত হুসাইন আহমদ মাদানীর পায়ে পড়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন, "মহান আল্লাহর দোহাই আপনি আপনার বক্তব্য পরিবর্তন করুন। অন্যথায় আপনার ফাঁসি হয়ে যাবে। আর এই নাজুক পরিস্থিতিতে আপনার মত লোকের বেঁচে থাকা জাতির জন্য একান্ত প্রয়োজন।" তার এই আবেগ তাড়িত

অভিব্যক্তি শুনে হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) বললেন, "হে জাওহার ! যদি বক্তব্য পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে তো ঈমানও পরিবর্তন হয়ে যাবে। তাহলে আর থাকবে কি ? সারা জীবন আক্বীদার বিভ্রমে কাটবে। " এর কিছু দিন পর করাচীতে অনুষ্ঠীত খেলাফত কনফারেন্সে মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) তার দেয়া ভাষণের এক পর্যায়ে বলেন-

لئے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل

شہید ناز کی تربت کہاں ہے

ফুল নিয়া ঠোঁটে ঘুরিয়া বেড়ায় উড়ন্ত
বুলবুল ,

খুঁজিয়া বেড়ায় শহীদ সমাধি দেয়ার তরে ফুল।

তিনি যখন এই উক্তি করেন তখন সময়টা ছিল এমন যখন আদালত থেকে তাঁর ফাঁসির আদেশ জারী হওয়ার সময় অত্যাসন্ন। অথচ এরই কিছু দিন পর ডেরাগাজী খানের এক সমাবেশে তিনি ইংরেজদেরকে লক্ষ্য করে দেয়া বক্তৃতার এক পর্যায়ে উর্দূ ছন্দে বলেন ,

کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا

ہم بھی کسی کے بنائے ہیں

فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے

سردار چڑھے کر بھی گائے ہوئے ہیں

شجرازادی کو خون دے کر سینچا

کے پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں

খেলনা মনে করে ধ্বংস করো না আমায়

আমাকেও কেউ সৃজন করেছেন।

ইংরেজ সৈন্য সম্পর্কে যে হারামের ফতওয়া

ফাঁসির কাষ্ঠেও তা বলবৎ থাকবে।

আযাদী বৃক্ষে রক্ত সিঞ্চন করতে হয়

তাহলে তার ফল অচীরেই পাকবে।

হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) উঁচুমানের একজন আলেমে দ্বীন বুযুর্গ ও সোনালী যুগের মুজাহিদদের মত একজন নির্ভীক মরদে মুজাহিদ ছিলেন। তিনি পাকিস্তানের বিরোধীতা করেছিলেন। কিন্তু তা ছিল একটি মহৎ উদ্দেশ্যে। তিনি বলতেন, ভারত বিভক্ত করে যদি পাকিস্তান বানাতে হয়, তাহলে দু টুকরো পাকিস্তান বানিয়ে কি লাভ? এতে ক্ষতিই হবে। একটি বড় অংশকে পাকিস্তান বানানো যেতে পারে, অন্যথায় পূর্বাংশের মুসলনানদের বিপদে পশ্চিমাংশের মুসলমান সাহায্য করতে পারবে না। তদ্রূপভাবে পশ্চিমাঞ্চলের বাসিন্দাদের বিপদকালে পূর্বাংশের লোক কোন সাহয্য করতে পারবে না। আমরা দেশ বিভক্তির বিপক্ষে নই, কিন্তু মুসলিম জাতিসত্ত্বাকে বিভক্ত করার

বিপক্ষে। কারণ, এখন ইংরেজরা মুসলমানদেরকে তিন ভাগে বিভক্ত করতে চাচ্ছে।

পরিশেষে যখন পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হল তখন হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) নিজের চিন্তা- চেতনার আলোকে নতুন রাষ্ট্রকে স্বাগত জানিয়ে বিবৃতি দিলেন। তাতে তিনি বললেন 'আজকের পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির দৃষ্টান্ত একটি মসজিদের ন্যায় যার ভূমি, ভিত্তি প্রস্তর এবং নির্মাণ কাজ নিয়ে প্রথমে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছিল; কিন্তু যখন মসজিদ নির্মিত হয়ে গেছে তখন প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ হয়ে গেছে ঐ মসজিদের উন্নতি-অগ্রগতি এবং সংরক্ষণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা। সুতরাং আমার আহ্বানও বন্ধু-বান্ধব, শুভানুধ্যায়ী এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিকট পৌঁছে দিন, যাতে পাকিস্তানে স্থিতিশীলতা আনয়ন এবং স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সকলে মিলে সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রাখে।'

জাতিগত সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে আল্লামা ইকবাল (রহঃ) একবার তাঁর সাথে মতবিরোধ করেছিলেন এবং তাঁর বিপক্ষে দু'চারটি কবিতাও আবৃত্তি করে ছিলেন। কিন্তু পরে যখন আল্লামা তালাতের মাধ্যমে হযরত হুসাইন আহমদ মাদানীর সঠিক অবস্থান আল্লামা ইকবালের কাছে পৌঁছে তখন তিনি

নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করে পত্র পাঠিয়ে ছিলেন। যা পরে ২৮ মার্চ ১৯৩৮ এ লাহোর থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'ইহসান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

নিজ জাতির প্রতি তার ভালবাসা এতই ছিলো যে, তিনি সর্বদা স্বদেশে তৈরী পোষাকাদী পরিধান করতেন এবং স্বদেশী পণ্যই ব্যবহার করতেন। এটি তিনি একাই করতেন না বরং অন্যদেরকেও এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতেন। এছাড়াও তাঁর ঘোষণা ছিল- আমি ঐ ব্যক্তির জানাযা পড়বো না যার কাফন স্বদেশী কাপড়ে না হবে। ঐ বিবাহ পড়াবো না যে বিবাহে মেয়ের পক্ষ থেকে উপঢৌকন হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) -এর উপঢৌকনের ন্যায় না হবে। এভাবে তিনি সারা জীবন বিভিন্নভাবে ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও সমাজ সংস্কারসহ বৃটিশ দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জিহাদ করে গেছেন।

হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) তাঁর জীবনের ৬২ বৎসরে ইলম এবং আমলের এমন এমন আলোকবর্তিকা তৈরী করে গেছেন যদ্বারা পাক-ভারত ছাড়াও সুদূর হেজাযের জ্ঞান পিপাসুরাও উপকৃত হয়েছেন। একটি তথ্য মতে ৪০ হাজার আলেম তাঁর থেকে জ্ঞান লাভে ধন্য হয়েছেন। হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) ১৬৭ জনকে ইসলাহী খেলাফত দানে সম্মানিত করেন। তাসাওউফ এবং আধ্যাত্মিকতার জগতেও তিনি ছিলেন সে কালের

অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব। মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) দীর্ঘকাল যাবৎ জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি ছিলেন। তিনি ছোট-বড় প্রায় চল্লিশোর্ধ গ্রন্থ রচনা করে জাতির জন্য রেখে যান। হযরত মাদানী (রহঃ) ছিলেন সুন্নাতে নববীর অনুপম প্রতিচ্ছবি ও অকৃত্রিম আশেক। তাঁর গোটা জীবনের প্রতিটি ক্রিয়া-কর্মই সুন্নাতের আঙ্গিকে সম্পাদিত হয়েছে।

ভারতের স্বাধীনতার সৌধ নির্মাণে পানির পরিবর্তে যদি আমার তাজা রক্ত এবং ইটের পরিবর্তে যদি আমার গোস্ত ও হাড় কাজে আসে তাহলে আমার জন্য এর চেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হতে পারে।

-মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (রহঃ)

ভারতের সিংহ পুরুষ

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (রহঃ)

এমন এক খ্যাতনামা ও মহৎ ব্যক্তিত্ব
যার কলম থেকে নির্গত অগ্নিঝরা লিখনী নাম-ডাক নিদ্রায় শায়িত জাতিকেও সজাগ করেছে। ফিরিয়ে দিয়েছে অচেতন জাতির নব চৈতন্য। জাতি কি করে এ মহা মনীষীকে বিস্মৃতির অতল তলে হারিয়ে ফেলবে? তাঁকে ভুলে থাকবেই বা কিভাবে? কি করে রক্তে লেখা ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যাবে তাঁর অম্লান স্মৃতি চিহ্ন? তিনি তো ছিলেন এমন এক মহান নেতা যাঁর নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা, ঐকান্তিকতা, একাগ্রতা, প্রতিভা ও স্মৃতিশক্তি গোটা পৃথিবীকে রীতিমত তাক লাগিয়ে দিয়েছিল! যেন তিনি ধরায় এলেন জাতির জন্য এক পরম উপঢৌকন হিসেবে! আমরা কিভাবে আমাদের এই মহা প্রাপ্তি স্মৃতির দর্পণ থেকে হারিয়ে ফেলতে পারি? পারি তাঁকে ভুলে যেতে? কশ্মীনকালেও নয়। এতক্ষণ যার কথা বলছিলাম এই মহান ব্যক্তিত্ব অন্য কেউ নন। তিনি হলেন জাতির এক মহান কর্ণধার হযরত মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (রহঃ)।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ উপমহাদেশের খ্যাতিমান এবং শীর্ষস্থানীয় নেতৃবর্গের অন্যতম। বৃটিশ দুঃশাসনের কবল থেকে এই উপমহাদেশের নির্যাতিত-নিপীড়িত মানবতাকে মুক্ত করতে স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর

অবদান ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসের সোনালী হরফে অঙ্কিত করে রেখেছেন। তাঁর রীতি নীতি নিয়ে মতবিরোধ করার মত বহু পন্ডিতের আবির্ভাব ঘটলে আল্লাহ প্রদত্ত তার যোগ্যতার স্বীকৃতি দিতে অমুসলিমরাও বাধ্য হয়েছে। তাদেরকেও অবনত শিরে মেনে হত তাঁর দেয়া যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য মতামত।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে পবিত্র মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন। গঙ্গা ও যমুনা বিধৌত এলাকা হিন্দুস্তানের ইমামের বাসস্থান এবং জন্মস্থান সেটাই হয়েছে যেটা মানবতার সবচেয়ে বড় ত্রাতা, পরম হিতৈষী ও মহা মনীষী আখেরী নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মস্থান ও বাসস্থান হয়েছিল। মাওলানা আবুল কালাম আযাদের নিষ্কলুষতা একদিক থেকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সাথে মিলে যায় এবং তার চিন্তা- চেতনা অনেক ক্ষেত্রে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সাথে একই বিন্দুতে গিয়ে একীভূত হয়।

সাত বৎসর বয়সে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ তাঁর পিতার সাথে ভারতবর্ষে হিজরত করেন। তাঁর আসল নাম ছিল মুহিউদ্দীন আহমদ। তিনি তাঁর শ্রদ্ধেয় খালার নিকট পবিত্র কুরআনের শিক্ষা লাভ করেন। এর পাশাপাশি প্রাচ্যের গোটা জ্ঞান ভাণ্ডার তিনি তার পিতার নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেন। শৈশব

থেকেই গভীর ধ্যান ও অধ্যয়নে মাওলানা আবুল কালাম আযাদের সীমাহীন আগ্রহ ছিল। কিতাব অধ্যয়ন ছিল তাঁর প্রিয় কাজ। কিতাব অধ্যয়নের পাশাপাশি তিনি কবিতা মনোনিবেশ করেন। বগ্মিতা এবং বক্তৃতার ময়দানে শুরু থেকেই তাঁকে অভিজ্ঞ মনে করা হয়। তুর্কি , ফার্সী , আরবী, উর্দূ এবং ইংরেজী ভাষায় ছিল তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য। লর্ড জজ এর মত উগ্রবাদী রক্ষণশীল ইংরেজও তাঁর বই পুস্তক ও রচনাবলীর সাবলীলতায় আকৃষ্ট এবং প্রভাবান্বিত না হয়ে পারেনি। নিয়াজ ফতেহপুরী লেখেন -"মাওলানা আবুল কালাম আযাদের রচনাবলী আমার দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নতুন এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অধিকারী। তাঁর লেখা নীরঙ্গেঁ আলম (نیرنــگ عـــالم), আখবারে ওয়াকীল (اخبار وكيل), আন্নাদ্ওয়াহ (الندو) ইত্যাদি পত্রিকায় যখন তিনি তাঁর যাদুতুল্য রচনা ছাপাতে শুরু করলেন তখন যেন উর্দূ ভাষার নব জীবন সঞ্চার হলো। "

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ সর্ব প্রথম "আল হেলাল" নামে উর্দূ ভাষায় একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। আর মূলতঃ এর মাধ্যমেই তিনি ভারতীয় রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। এই পত্রিকাটি পত্রিকা ছিল না , এটি ছিল একটি আগ্নেয়গিরি। তাঁর এই পত্রিকাটি অতি দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বলকান সহ অন্যান্য এলাকায় সংগঠিত মুসলিম নিধনের হৃদয় বিদারক ঘটনাগুলোর

চিত্র যখন এ পত্রিকাটি জাতির সামনে ফুটিয়ে তোলে, তখন পাঠক মাত্রই ক্রোধে ফেটে পড়ে এবং অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে। ফলে গোটা দেশে ইংরেজদের প্রতি ঘৃণা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বিক্ষুব্ধ জনতা ধীরে ধীরে তাদের শত্রুতে পরিণত হতে থাকে। এভাবে সপ্তাহ কয়েক না গড়াতেই যখন বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী দেশে একটা বিদ্রোহের আশংখা অনুভব করল তখন তারা মাওলানা আবুল কালাম আযাদসহ পত্রিকাটির উপর কড়া নজরদারি শুরু করল। এটি বেশী আগের কথা নয়। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। বাক-স্বাধীনতা ও সংবাদ পত্রের অবাধ স্বাধীনতার মাধ্যমে যদি কেউ কারো শীতল অন্তরে প্রচণ্ড উত্তাপ ও ঝটিকা প্রবাহের সৃষ্টি করতে পারে তাহলে সেটা মাওলানা আবুল কালাম আযাদের পক্ষেই সম্ভব। তিনি ছিলেন একজন আপোষহীন ও বলিষ্ঠ কলম সৈনিক। অর্থের প্রলোভনে অনেক সংবাদপত্রই বিক্রি হয়ে যায়, কিন্তু মাওলানা আবুল কালাম আযাদকে ইংরেজ শতচেষ্টা করেও অর্থের জালে আটকাতে পারেনি। তাঁর পত্রিকা "আল হেলাল" সম্পর্কে শাইখুল হিন্দ (রহঃ) বলেন, "আবুল কালাম আযাদ নামে আমাদের এক যুবক আছে। যার কলমের ক্ষুরধার লিখনী স্বাধীনতা আন্দোলনে এক নব জাগরণ সৃষ্টি করেছে। এটা এমন এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ, যা অনেক বড় বড় রাজনৈতিক দল বা সামাজিক সংগঠনের পক্ষেও সম্ভব হয়নি।"

বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী মাওলানা আবুল কালাম আযাদের সাপ্তাহিক "আল হেলাল" পত্রিকাটি বন্ধ করে দেয়ার পর কিছু দিন না যেতেই তিনি 'আল বালাগ' নামে আরেকটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিন্তু ১৯১২ সালে রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে পড়ে এটির প্রকাশনাও বন্ধ হয়ে যায় । শোকার্ত মাওলানা আযাদ থেকে থাকেননি। তিনি এরপর "পরগাম" নামে আরেকটি পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করেন। অতঃপর ১৯২৮ সালে পরিস্থিতি অনুকূল ভেবে তিনি পুনরায় "আল হেলাল" পত্রিকাটির প্রকাশনা শুরু করেন। এবারও তাঁর জীবনের জ্বলন্ত প্রদীপে স্বৈরাচারী বৃটিশ বেনিয়ারা দুঃশাসনের রক্ত চক্ষুর গ্রাসী দৃষ্টিবান ছুঁড়ে দেয়। প্রদীপ নিভাতে ফুৎকার দেয় সজোরে। পরিশেষে এভাবে মাওলানা আবুল কালাম আযাদের জীবনের প্রশস্ত সড়কে তৈরী করা হয় অনাকাংখিত বহু গতিরোধক (স্প্রীট ব্রেকার)। দেখা দেয় আঁকা-বাঁকা অসংখ্য গলিপথ। কিন্তু হাজারো প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মাওলানা আযাদ কখনোই তাঁর আদর্শ ও সুনির্দিষ্ট মিশন থেকে এক বিন্দুও সরে দাঁড়াননি। অকুতোভয় সৈনিকের মত তিনি শুধু এগিয়েই গেছেন। মাওলানা আবুল কালাম আযাদ আযাদী আন্দোলনে চির স্মরণীয় ও চির প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন। সত্যবাদিতা, নির্ভীক বক্তৃতা ও রচনা এবং আযাদী আন্দোলন করার অপরাধে (?) বঙ্গ প্রদেশ থেকে তাঁকে নির্বাসিত করা হয়।

এর কিছুকাল পর বৃটিশ সরকার তাঁকে রাচীর দুর্গম একটি এলাকাত তাঁকে নযরবন্ধী করে সত্যের আওয়াযকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করে। ১৯২১ সালে যখন খেলাফত আন্দোলনের যৌবনকাল ছিল তখন তিনি দেশের আনাচে-কানাচে উসমানী খেলাফতের সংরক্ষণ এবং জুলয়ানওয়ালাবাগের হৃদয় বিদারক ঘটনা সম্পর্কে মর্মস্পর্শী বক্তব্য দেন। যেমনটি হিন্দু নেতা গান্ধীকেও অকপটে স্বীকার করতে হয়েছে। মিঃ গান্ধী বলেন, "তাহরীকে খেলাফতের বদৌলতে আন্দোলনের সুপ্ত চেতনা এমনভাবে জেগে ওঠে যে গোটা দুনিয়ায় তার ঢেউ লেগেছে।"

মাওলানা আবুল কালাম আযাদের বক্তৃতার অবস্থা এমন ছিল যে, একবার তিনি অল পার্টি কনফারেন্স-এ (ভারতের একটি সর্বদলীয় সংগঠন) বক্তৃতা করবেন। এ সুবাদে সেখানে শ্রোতা সেজে তাঁকে হত্যা করার হীন মতলবে হাজির হল ইংরেজ শাসকদের পদলেহী দু'শ সন্ত্রাসী। তারা এসে সুবিধামত স্থানে ওঁৎ পেতে বসেছিলো। কিন্তু কিছুক্ষণ পর যখন মাওলানা আবুল কালাম আযাদ জ্বালাময়ী ও মর্মস্পর্শী বক্তৃতা শুরু করলেন তখন সেসব শ্রোতাবেশী গুণ্ডারা তার বক্তৃতায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। মাওলানা আবুল কালাম আযাদের কথাগুলো তাদের হৃদয়-গাত্রে তীর ও বর্শার মত বিঁধতে লাগল।

অন্যদিনের ঘটনা- একটি শত্রু চক্র মাওলানা আবুল কালাম আযাদের নিকট লিখে পাঠাল 'আপনি আমাদের এখানে অনুষ্ঠিতব্য সেমিনারে অংশ গ্রহণ করবেন না! এরপরও যদি বক্তৃতা করতে আসেন তবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত হয়ে আসুন!' তাদের এই হুমকির উত্তরে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ লেখেন, 'তোমাদের চিরকুট পাওয়ার আগ পর্যন্ত উক্ত প্রোগ্রামে আমার অংশ গ্রহণ করাটা অনিশ্চিত ছিল। সঙ্গত কোন কারণে হয়তো প্রোগ্রাম বাতিলও হতে পারতো। কিন্তু এখন জেনে রাখ, ইংশাআল্লাহ আমি অমুক গাড়িতে অমুক সময় কোন দেহরক্ষী ছাড়া একাই গিয়ে পৌঁছব। যদি কারো সাহস হয়, বুকে হিম্মত থাকে তাহলে আমাকে ঠেকাতে এসো!'

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ বুকের তাজা রক্ত দিয়ে ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস রচনা করেন। একবার তিনি ইংরেজ দুঃশাসনের রোষানলের শিকার হয়ে অন্তরীণ জীবন কাটাচ্ছিলেন। বন্দিদশার মানবেতর জীবন অতিবাহনের এক সন্ধিক্ষণে সংবাদ এল-বাড়িতে তাঁর স্ত্রী মুমূর্ষু অবস্থায় মৃত্যুর প্রতিক্ষায় আছে। তখন সেখানে তাঁর অন্যান্য সাথীরা তাঁকে অনুরোধ জানালো স্ত্রীর সাথে শেষ বারের মত সাক্ষাৎ করার আবেদন জানিয়ে জেল কর্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত দিতে। এতে তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, 'আমি ইংরেজদের নিকট আমার ব্যক্তিগত

কোন বিষয়ে কোন আবেদন পত্র প্রেরণ করতে আদৌ রাজি নই।' কিছুদিন পর সংবাদ এল তাঁর স্ত্রী পরপারে পাড়ি দিয়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। তখন তিনি প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, হাশরের মাঠে আমার সাথে ওর সাক্ষাৎ হবে।'

ভারতবর্ষের দেদীপ্যমান প্রদীপতুল্য
এই মহা মনীষী সুদীর্ঘকাল যাবত হিন্দু- মুসলিম ঐক্য সংগঠন 'অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস'র সভাপতি ছিলেন। তিনি 'সায়মব কমিশন', 'অল ইন্ডিয়া পার্টিস কনফারেন্স', শামলাহ্ কনফারেন্স, ভারত ছাড় আন্দোলন এবং পালামেনী মিশন ইত্যাদি বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে এই উপমহাদেশ থেকে ইংরেজ দুঃশাসনের সমাধি রচনা করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যান। দেশ বিভক্তির পর তিনি দীর্ঘ সময় ভারতের শিক্ষা মন্ত্রী ছিলেন। সত্যবাদিতা এবং ঈর্ষনীয় বীরত্ব ও শৌর্য-বীর্যের ইতিহাসে তিনি নতুন মাত্রা সংযোজন করেন। মাওলানা আবুল কালাম আযাদ জীবনের সুদীর্ঘ আটটি বৎসর কারাগারে অতিবাহিত করেন। তিনি আযাদী আন্দোলন অসংখ্য-অগণিত গ্রন্থ রচনা করেন। যার মধ্যে তাফসীরে তরজুমানুল কুরআন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর সে তাফসীর ব্যতিক্রমধর্মী উচ্চাঙ্গের একটি তাফসীর গ্রন্থ। যাতে সাহিত্যকলা, উচ্চাঙ্গের রচনা শৈলী, এবং বিশুদ্ধতা ও নির্ভর

যোগ্যতার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

আমি হিন্দুস্তান ফিরে যাব না। আমি আমার মাতৃভূমিকে স্বাধীনতার অলংকার পরাব কিংবা জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাব এবং সাত সমুদ্র ওপারের এই বৃটেন থেকে আমার লাশ কবরের পথে যাত্রা করবে।

- মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জাওহার (রহঃ)

মুজাহিদে মিল্লাত

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জাওহার (রহঃ)

'আমি হিন্দুস্তান ফিরে যাব না। আমি আমার মাতৃভূমিকে স্বাধীনতার অলংকার পরাব কিংবা জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাব এবং সাত সমুদ্র ওপারের এই বৃটেন থেকে আমার লাশ কবরের পথে যাত্রা করবে।'

আযাদী আন্দোলনের অন্যতম শীর্ষ যে নেতার মুখ থেকে এই কথাগুলো উচ্চারিত হয়েছিল তিনি হলেন হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জাওহার (রহঃ)। ইংরেজদের গোলামীর ঘোর

বিরোধিতা এবং নিজ মাতৃভূমির স্বাধীনতা লাভের অদম্য স্পৃহা মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জাওহার (রহঃ) –এর শিরা-উপশিরায় বিরাজমান ছিল। তিনি একদিকে যেমন ইসলামী জগতের শীর্ষ ব্যক্তিত্ব ছিলেন তেমনি অন্য দিকে ইংরেজী শিক্ষায়ও তিনি ছিলেন অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। আর এ ব্যাপারে এক ইংরেজী কমিশনের সামনে তিনি যে, দীর্ঘ ১৪ ঘন্টা ইংরেজীতে বক্তৃতা করেন তাই প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট।

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি স্বদেশ (ভারতে) এসেই ইংরেজী ভাষায় 'সাপ্তাহিক কমরেড' নামে একটি পত্রিকা করেন। অল্প দিনেইর মধ্যে এই পত্রিকাটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। জনগণ এর প্রতি ঝুঁকে পড়ে। তাই অধিকাংশ সময়ই এই পত্রিকাটিকে ইংরেজ দুঃশাসনের কোপানলের লক্ষ্যস্থল হয়ে থাকতে হয়। পরিশেষে এক পর্যায়ে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়। তখন মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জাওহার (রহঃ) আরেকটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেন।

পরবর্তীতে মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার (রহঃ) জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জামেয়া মিল্লিয়ার সাথে সম্পৃক্ত থাকেন। মাওলানা জাওহার (রহঃ) আযাদী আন্দোলনে চির স্মরণীয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন

স্বাধীনতা আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ববর্গের অন্যতম। তিনি শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান এবং মাওলানা আবুল কালাম আযাদের হাতকে শক্তিশালী করতে গিয়ে ভারত উপমহাদেশের আনাচে-কানাচে ইংরেজ বিরোধী জনমত গঠনে ছড়িয়ে পড়েন এবং ইংরেজ দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দাবানল প্রজ্জ্বলিত করতে থাকেন।

তিনি ১৯১৩ সালের বলকান যুদ্ধের সময় একটি প্রতিনিধি দলের মুখপাত্র হয়ে বলকান গমন করেন। ১৯১৪ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'লন্ডন টাইমস' পত্রিকায় মুসলমানদের প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও তাদের জন্য অপমানকর বক্তব্যসহ একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তখন মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জাওহার (রহঃ) দিল্লী থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'হামদর্দ' এবং সাপ্তাহিক 'কমরেড' পত্রিকায় ঐ প্রতিবেদনের জবাবে এমন অগ্নিঝরা বিবৃতি দেয়া শুরু করেন যে শেষ পর্যন্ত ঐ ইংরেজ প্রতিবেদকের জীবন নিয়ে পালানোই দুষ্কর হয়ে পড়ে। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জাওহার (রহঃ) কে গ্রেফতার করা হয়। ১৯১৭ সালে তিনি এই বন্দীদশা থেকে মুক্তি লাভ করেন। মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার (রহঃ) ইংরেজ দুঃশাসন থেকে নিপীড়িত মানবতাকে মুক্ত করার জন্য দিন-রাত একাকার করে ফেলেন। তিনি সুশ্রী মুখাবয়ব, উত্তম

চরিত্র, অতিথি পরায়ণতা, দেশ প্রেম, নির্ভীক সত্যবাদিতা এবং সৎ চরিত্র ও উত্তম গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। মাওলানা জাওহার (রহঃ) তাঁর একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'নকীব হামদর্দ' এর মাধ্যমে ইংরেজ দুঃশাসনের হোতা, তাদের চামচা এবং অত্যাচারী পদস্থ কর্মকর্তা- কর্মচারীদেরকে চরম নাকানি-চুবানি খাইয়ে দেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জাওহার (রহঃ)
-এর জিহাদী কার্যক্রমের মধ্যে তাঁর সেই কীর্তিও অন্যতম যা তিনি কানপুর দাঙ্গার সময় আঞ্জাম দিয়ে ছিলেন। বিষয়টি এই যে, কানপুরের একটি মসজিদের আংশিক ধ্বংস সাধন করা হয় এবং তাতে কয়েকজন মুসলমান শহীদ হন। তখন তিনি ইংলিশস্তান সফরে যান এবং সেখানে সরকারী মুখপাত্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বক্তৃতা-বিবৃতি দেন। পাশাপাশি শহীদদের ক্ষতি পূরণসহ কানপুরের মুসলমানদের সকল দাবী দাওয়া মেনে নিতে সরকারকে বাধ্য করেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জাওহার (রহঃ) তাঁর অসাধারণ যোগ্যতা বলে ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান ইবনে সাউদ আহুত আন্তর্জাতিক ইসলামী মহা সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। ভারতের ইতিহাসের পাতায় আজও মাওলানা মুহাম্মাদ

আলী জাওহারের নাম দীপ্তিমান হয়ে আছে। তাঁর অসাধারণ এবং চিরস্মরণীয় কীর্তিগুলোর মধ্যে 'খেলাফত কনফারেন্স ও অল পার্টি কনফারেন্সে অংশ গ্রহণ, সায়মন কমিশনে শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন, নেহরু রিপোর্টে আন্তর্জাতিক ভূমিকা' ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জাওহার (রহঃ) ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে লন্ডনে ইন্তেকাল করেন এবং বায়তুল মোকাদ্দাসে সমাধিস্থ হন।

ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহকে, আনুগত্যের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং খেদমতের মাধ্যমে সৃষ্ট জীবকে সন্তুষ্ট রাখো।

- হযরত মাওলান আহমাদ আলী লাহোরী (রহঃ)

শাইখুত তাফসীর

হযরত মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী (রহঃ)

চতুর্দিক থেকে বৃষ্টির মত পাথর নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। বয়ে যাচ্ছে রক্তের বন্যা। কিন্তু প্রস্তরে-প্রস্তরে বন্ধুর আর রক্তে পিচ্ছিল পরিবেশে ও পরিসরে এক ব্যক্তি পাহাড় সম বিপদ উপেক্ষা করে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ তায়ালার অমিয় বাণী পবিত্র কুরআনের তা'লীম ও প্রচার-প্রসার করে যাচ্ছেন। ভাবতেও অবাক লাগে যে, এত প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা তাঁর ধৈর্য্য ও সহনশীলতায় বিন্দু মাত্রও পরিবর্তন আনতে পারেনি! তিনি নির্ভয়, নির্ভাবনা ও নির্বিকার ভাবে স্বীয় মিশন চালিয়েই যাচ্ছেন! স্বীয় মিশন পরিচালনায় অনড়-অবিচল এই মহান ব্যক্তিত্ব অন্য কেউ নন। তিনি হযরত মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী (রহঃ)। বিশ্ববাসী তাঁকে এ নামেই চেনেন,

জানেন। তিনি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত লাহোরের শিরানওয়ালা মসজিদে কুরআনে কারীমের দরস দেন।

মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাব প্রদেশের গুজরানওয়ালা জেলার জালালাবাদের এক শিখ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। পরে তাঁর পিতা মুসলমান হয়ে যান । তিনি তাঁর সম্মানিত জননীর কাছেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। কিছু কাল পরে মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী (রহঃ) উক্ত গ্রামে আগমন করেন। ঐ সময় তাঁর সম্মানিতা পিতা তাঁকে বিপ্লবী নেতা হযরত উবাইদুল্লাহ সিন্ধী (রহঃ) -এর মুবারক হাতে তুলে দেন। আর তখন থেকেই তিনি উপমহাদেশের নিপীড়িত মুসলমানসহ সকলের জন্য এক অব্যক্ত মর্মজ্বালা, সীমাহীন বেদনা অনুভব করতে থাকেন।

এরপর তিনি তৎকালীন প্রসিদ্ধ আধ্যাত্মিক নেতা হযরত মাওলানা গোলাম মুহাম্মাদ দ্বীনপুরী সাহেব (রহঃ) -এর নিকট চলে যান। দীর্ঘকাল সেখানে অবস্থানের পর তিনি আম্রোট এর হযরত মাওলানা তাজ মাহমূদ (রহঃ) –এর নিকট যান। ইত্যবসরে হযরত মাওলানা উবালদুল্লাহ সিন্ধী (রহঃ) নিজ কন্যাকে তার সাথে বিয়ে দেন। তিনি সিন্ধের পীর ঝাণ্ডায় অবস্থিত দারুল ইরশাদ ফারেগ হওয়ার পর শাহ্ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে

দেহলভী (রহঃ) –এর মিশন দিল্লীস্থ ইদারায়ে নাযারাতুল মাআরিফ নামক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত হন।

যখন মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী (রহঃ) রেশমী রুমাল আন্দোলনের কার্যক্রম নিয়ে কাবুল সফরে যান তখন মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী (রহঃ) তাঁর উক্ত মিশনের কার্যক্রম চালিয়ে যান। এখানে তিনি প্রতিদিন কুরআনের দর্শনের উপর দরস চালিয়ে যান এবং ইংরেজ ও তাদের অনুচর-তল্পিবাহীদের অনিষ্টতা সম্পর্কে গণ জাগরণ সৃষ্টি করতে থাকেন। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের কথা। একবার তিনি দরস দিচ্ছিলেন, হঠাৎ একদল শেতাঙ্গ পুলিশ এসে তাঁকে গ্রেফতার করে জেলে নিয়ে যায় । তাঁর অপরাধ ছিল এটাই যে, মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী (রহঃ) -এর চিঠিপত্র তাঁর কাছে আসত। উপরন্তু মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী (রহঃ) মাওলানা সিন্ধীর স্বাধীনতা আন্দোলনের সদস্য। ফলে তিনি এখনও বিপ্লবী সিপাহসালার মাওলানা সিন্ধী (রহঃ) -এর সেই মিশন চালু রেখেছেন। গ্রেফতারের পর পুলিশ কর্তৃক হাতকড়া পরিহিত মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী দিল্লী থেকে শামলাহ স্থানান্তরিত হন।

সেখানে তাঁকে মেজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থিত করা হয়। মেজিস্ট্রেট তাঁকে বিভ্রান্তিমূলক বিভিন্ন প্রশ্ন করে।

প্রশ্নোত্তরের পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়া হয় তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করতে। তারা নির্দেশ তামিল করে।

সুদীর্ঘ একটি সময় এই মর্দে মুজাহিদ সেখানে বন্দিশালার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে মানবেতর জীবন যাপন করেন। পরিশেষে তাঁকে কড়া পুলিশী প্রহরায় লাহোর আনা হয়। কি মর্মস্পর্শী দৃশ্য! অবিশ্বাস্য পরিবেশ! এই শীর্ষস্থানীয় আলেমের পায়ে লোহার শিকল, হাতে কড়া, গলায় লোহার জিঞ্জির! যিনি সারাটি জীবন রাজকীয় হালতে কাটিয়েছেন আজ তিনি পুলিশী প্রহরায় পদব্রজে যাচ্ছেন! দীর্ঘ পদ যাত্রার পর তাঁকে মেজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হয়। মেজিস্ট্রেট নির্দেশ দেয় তাঁকে নোলখার কারাগারে নযর বন্দী করে রাখতে। নির্দেশ মোতাবেক তাঁকে সেই কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। কিছুদিন পর তাঁকে সেখান থেকে জালেন্ধের কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়। এভাবে সর্ব প্রকার কষ্ট, যাতনা ও নির্যাতনের স্ট্রীম রোলার চালিয়ে ইংরেজরা মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরীকে তাদের বিরোধীতা থেকে সরানোর সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু ইংরেজরা যেসব মুসলমানকে নির্যাতন ও পরাধীনতার দুর্ভেদ্য জিঞ্জিরে আবদ্ধ করেছে তারা কি করে ইংরেজদের প্রতি চরম ঘৃণা পোষণ থেকে সরে দাঁড়াবে? এবং কি করে স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা এই মহামনীষী

জাতির প্রতি অত্যাচারের কথা ভুলে যাবে? মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী (রহঃ) সম্পর্কে দিল্লীর একটি দৈনিক পত্রিকার ভাষ্য হল, 'মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী ইংরেজদের এমন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন যে, একবার তাঁকে কারাগারে বরফ খণ্ডের উপর শুইয়ে তাঁর রক্ত-সঞ্চালন বন্ধ করে দেয়া হচ্ছিল! কিন্তু তখনও তাঁর যবান থেকে দৃঢ়তার সাথে উচ্চারিত হচ্ছিল 'বরফের স্তুপে শুইয়ে দেহ ঠান্ডা করানো যেতে পারে, কিন্তু ঈমানের উত্তাপে কোন পরিবর্তন আনা যাবে না!'

দীর্ঘ কারাভোগের পর মুক্তি পেয়ে মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী (রহঃ) লাহোর আগমন করেন। মুক্তির সাথে সাথে ইংরেজরা তাঁর বাহিরে যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে। তাই তিনি লাহোরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। পরে যখন তিনি প্রথম বারের মত শীরানওয়ালায় পবিত্র কুরআনের তাফসীর শুরু করেন। তখন তাঁর উপর হিন্দু সম্প্রদায় বৃষ্টির মত পাথর বর্ষণ করতে থাকে। মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী (রহঃ) সে একই জায়গায় একটানা চল্লিশ বৎসর পবিত্র কুরআন এর তাফসীর শিক্ষা দিয়ে যান। পরিস্থিতি এক সময় এমন ছিল যে, এখানে কেউ তাঁর সাহায্যকারী ছিল না! কিন্তু যখন এই মনীষীর লাশ সমাধী পথে যাত্রা করে তখন আড়াই লক্ষাধিক লোক তাঁর জন্য অশ্রু বিসর্জন দেয়!

মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী (রহঃ) সারাটি জীবন ইংরেজ ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে গেছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর তিনি পাকিস্তানের 'জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম -এর সদস্য হন। সাথে সাথে তিনি সকল স্বৈরাচারী জালিম শাসকদের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়ে ওঠেন। তাঁর সংগ্রামী জীবনে তিনি হাতকড়া পরেছেন, কারাবরণ করেছেন, সর্বত্রই তিনি নববী পদ্ধতিতে ইসলাম-তাওহীদ ও সুন্নাতের পয়গাম দিয়েছেন। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সবাইকে তিনি ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। দাওয়াত দিয়েছেন ইসলামের অমীয় সুধা পানের।

মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী (রহঃ) দীর্ঘকাল 'জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম' পাকিস্তানের আমীর ছিলেন। তিনি পবিত্র কুরআনের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ লিখে গেছেন, যা সর্ব মহলে আজও ব্যাপকভাবে সমাদৃত। তাঁর রচীত পুস্তিকার সংখ্যা প্রায় শতাধিক। দ্বীনি তাবলীগের ময়দানে তাঁর ত্যাগ ও কুরবানীর ফসল 'সাপ্তাহিক খুদ্দামুদ্দীন' আজও গোটা দুনিয়ায় দ্বীনের প্রচার প্রসার হকের বাণী ছড়িয়ে দেয়ার কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

আমি সকালে কোথায়, বিকেলে কোথায়, দিনে কোথায় এবং রাত্রে কোথায় যাব, কোথায় থাকবো, কোথায় বক্তৃতা করব তা আমি নিজেও জানি না।

- হযরত সাইয়্যেদ আতাউল্লাহ শাহ্ বুখারী (রহঃ)

এশিয়ার মহান নেতা

আমীরে শরীয়ত হযরত মাওলানা

সাইয়্যেদ আতাউল্লাহ শাহ্ বুখরী (রহঃ)

এমন কে আছে যে মুসলিম ইতিহাসের এই শ্রেষ্ঠ মুজাহিদ সম্পর্কে অবগত নয়, যিনি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে কথা বলে ১১ বৎসর কারা বরণ করেছেন। যাঁকে পৃথিবী থেকে চির বিদায় করার হীন ষড়যন্ত্রে দুশমনরা একে একে তিন বার তাঁর খাদ্যে বিষ মিশিয়েছিল। এখানেই শেষ নয়, বৃটিশ শাসনবসানের সক্রিয় কর্মী হওয়ায় তিন তিন বার তাঁর ফাঁসির আদেশও দেয়া হয়েছিল। খোদা প্রেমিক, আবেদ ও দ্বীনের জন্য আত্মোৎসর্গী মুজাহিদদের প্রাণের স্পন্দন এই মনীষী উর্দূ ভাষার শ্রেষ্ঠতম খ্যাতিমান ও অনলবর্ষী বক্তা ছিলেন।

ইংরেজ দুঃশাসনের করাল গ্রাস থেকে মুসলিম জাতি সত্ত্বাকে রক্ষা করা ছিল হযরত আতাউল্লাহ শাহ্ বুখরী (রহঃ) -এর সার্বক্ষণিক চিন্তা-ফিকির। কাদিয়ানী মিথ্যা মতবাদের ফণাকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়া ছিল তাঁর মিশনের উৎস। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এমন বিত্ত-বৈভব দান করেছিলেন যে, তিনি ইচ্ছে করলে স্বর্ণ দিয়ে অট্টালিকা নির্মাণ করতে পারতেন। কিন্তু নির্মম সত্য হল, তাঁর লাশ জানাযার জন্য ভাড়ার একটি জীর্ণ কুঠির থেকে বের করা হয়। এটাই হযরত

আতাউল্লাহ শাহ্ বুখারীর মত মনীষীর পরিচিতি।

যখন হযরত আতাউল্লাহ শাহ্ বুখারী (রহঃ) রাজনৈতিক অঙ্গণে পদার্পণ করেন তখনই তাঁর উপর শুরু হয় জালিম বৃটিশ শাসকের নির্যাতনের অব্যাহত ধারা। তাঁর ভাগ্যাকাশে নেমে আসে কালো মেঘের ঘনঘটা। বিপদের হাতছানি দেখা দেয় জীবনের প্রতিটি পদে পদে। ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলার হুংকার তাঁকে তাড়িত করে ক্ষণে ক্ষণে। বন্দীশালার অবরুদ্ধ জীবন তাঁকে পিছু নেয় এ ছিল তাঁর দুর্বিসহ জীবনের এক ঝাটিকা প্রবাহ।

এমন প্রতিকূল ও বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে দেশ ও জাতির জন্য লড়াই করা কোন চরম পরাকাষ্ঠের পরিচয়দাতা ব্যক্তির জন্যও দুঃসাধ্য ছিল। তখন দ্বীনের নামী- দামী ও সক্রিয় অনেক কর্মীরাও গৃহের নিভৃত কোনে প্রশান্তিতে দিন কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু তখনও তিনি বীর-দর্পে মাঠে কাজ করে যাচ্ছিলেন। তিনি গোটা ভারতে ইংরেজ বিদ্রোহের বীজ বপন করে দিলেন। হযরত সাইয়্যেদ আতাউল্লাহ শাহ্ বুখারী সে সব মুজাহিদদের অন্তর্ভুক্ত যাঁরা নিজেদের বুকের তাজা রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘোষণা লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

খদ্দরের মোটা কাপড় ছিল তাঁর পোষাক। যবের রুটি আহার্য। রাত্রি জাগরণ ছিল

নিত্য অভ্যাস। দারিদ্রের কষাঘাত, ভ্রমণের সহজাত ক্লেশ সবই ছিল তাঁর জন্য মা'মুলি ব্যাপার। একে একে পাঁচটি বৎসর নির্যাতনের ভয়ংকর স্ট্রীম রোলার চালিয়েও তাঁকে এক তিল পিছপা করতে পারেনি ইংরেজ বেনিয়া অপশক্তি।

সাইয়্যেদ আতাউল্লাহ শাহ্ বুখারী (রহঃ) মজলিসে ইহরারে ইসলামের (ইসলামী স্বাধীনতা আন্দোলনের) প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এক সময় গোটা পাাবে তাঁর আন্দোলনের এমন বাহিনী ছিল যে, ইংরেজ প্রশাসন সর্বক্ষণ তাদের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকত। তাঁর বক্তৃতায় আল্লাহ প্রদত্ত এমন প্রভাব ছিল যে, অমুসলিমরাও তাতে প্রভাবান্বিত না হয়ে পারত না। সেকালে বক্তৃতার জগতে তিনিই ছিলেন একমাত্র অনলবর্ষী ও মর্মস্পর্শী বক্তা।

চরিত্র গুণে হযরত সাইয়্যেদ আতাউল্লাহ শাহ্ বুখারী (রহঃ) ছিলেন মোহনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সেবায় ও সহমর্মিতায় অনেক সময় তিনি (শারিরীক ভাবে) ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। তাঁর প্রতিটি কাজ ছিল জামা'আত ভিত্তিক, সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক।

হযরত আতাউল্লাহ শাহ্ বুখারী (রহঃ) উপমহাদেশের আনাচে-কানাচে, পথে-প্রান্তরে, মাঠে-ঘাটে সর্বত্র ঘুরে ঘুরে ইসলামের

সার্বজনীন সত্যতা, অকৃত্রিমতা এবং অবিনশ্বরতা সম্পর্কে মানুষকে বোঝাতেন। এমন শত শত জন পদে তিনি অসংখ্য অগণিত সমাবেশ করে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দেন যেখানকার মানুষ ইসলাম সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণাটুকুও রাখত না। তাঁর অনলবর্ষী ও মর্মস্পর্শী বক্তৃতা শুধু মুসলমানরাই শুনত তা নয়, বরং অমুসলিমরাও তা অতীব আগ্রহের সাথে শ্রবন করত। তাঁর বক্তৃতায় এমন প্রভাব বিরাজ করত যে, তিনি কখনো এশা'র পর বক্তৃতা শুরু করে একটানা ফজর পর্যন্ত বয়ান চালিয়ে যেতেন, ওদিকে ফজরের আজানও হয়ে যেত কিন্তু তবুও একজন শ্রোতাও সমাবেশ থেকে উঠত না। এমনকি অন্যমনষ্কও হত না। এ জন্যই মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জাওহার রসিকতা করে বলেছিলেন "যদি আমার ক্ষমতা থাকতো তাহলে আমি শাহ্ সাহেবকে বক্তৃতা করতে দিতাম না। কারণ তিনি তো বক্তৃতা করেন না! যাদু দিয়ে শ্রোতাদের বশ করেন!"

হযরত আতাউল্লাহ শাহ্ বুখারী (রহঃ) একা কেবল বক্তৃতার মাধ্যমে ইসলামের যে কাজ করতেন তা অনেক বড় বড় দল বা সংগঠনের পক্ষেও করা সম্ভব হত না। সাইয়্যেদ আতাউল্লাহ শাহ্ বুখারী (রহঃ) যখন জানতে পারলেন যে, ডেরাগাজীখান নামক জায়গায় এবং মুজাফ্ফর নগর এলাকার অজ্ঞ মুসলমানরা নিজের মেয়েকে নিজেই বিয়ে করে (যা একান্তই হারাম) এবং দ্বীন-ধর্মের ব্যাপারে তাদের

মৌলিক প্রয়োজনীয় জ্ঞানটুকুও নেই। তখন তিনি সংগঠন থেকে অবসর নিয়ে সেসব এলাকায় মাসের পর মাস সময় সফর করে অতিবাহিত করেন। পাড়ায়-পাড়ায়, মহল্লায়-মহল্লায় এবং গ্রামে-গ্রামে গিয়ে কুরআন না জানা লোকদেরকে কুরআন শুনান। একেক এলাকায় কয়েকদিন পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে মানুষের অন্তরে ইসলামের আলো প্রজ্জ্বলিত করেন। কুরআন-হাদীসের আলোকে উদ্ভাসিত করেন। ফলে দেশের একটা বিরাট অংশ ইসলামের উপর আমল করতে শুরু করে।

সাইয়্যেদ আতাউল্লাহ শাহ্ বুখারী (রহঃ) দেশ বিভক্তির বিরোধীদের কাতারে ছিলেন। তাঁর নীতি ছিল আমরা এমন বিভক্তি মেনে নেব না, যা ইংরেজদের হাতে সম্পাদিত হবে। একবার তিনি দিল্লীর জামে মসজিদে বক্তৃতা করতে গিয়ে এক পর্যায়ে ইংরেজদের বিভক্তিকে লক্ষ্য করে বলেন, এমন এক সময় আসবে যখন পূর্ব কিংবা পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমানদের উপর কোন বিপদ এলে পরস্পরের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে পারবে না। কারণ মাঝে দীর্ঘ এক হাজার মাইল বিস্তৃত এলাকা জুড়ে বাস করবে আমাদের শত্রু হিন্দুগোষ্ঠী। জাতি আজ অপলক নেত্রে অবলোকন করছে সে একজন আল্লাহ ওয়ালা দরবেশের কথা আজ অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সাইয়্যেদ আতাউল্লাহ শাহ্ বুখারী (রহঃ) কখনো ইংরেজ বণিকদের সাথে আপোষ করেননি। বড় বড় নবাবরাও তাঁর সান্নিধ্য অর্জনের জন্য সর্বদা ব্যতি-ব্যস্ত থাকত। কিন্তু তিনি কারো কাছে ধরা দিতেন না। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই কাটে জেলে এবং রেলে (রেল গাড়ীতে ভ্রমণ করে)। তিনি নিজেই বলেন, আমি সকালে কোথায়, বিকেলে কোথায়, দিনে কোথায় এবং রাত্রে কোথায় যাব, কোথায় থাকবো, কোথায় বক্তৃতা করব তা আমি নিজেও জানি না। (আমি বাহিরে থাকলে) লোকেরা বলতো, সাবাশ শাহ্জী। জেলে চলে গেলে বলতো হায়! শাহ্জী আফসোস। এই সাবাশ আর আফসোসের মধ্যে জীবনটা শেষ হয়ে গেল।

মহান আল্লাহ তাঁকে জান্নাতের সুউচ্চ মাকামে সমাসীন করুন। আমীন।

সমাপ্ত

[illegible]

مكتبة الأشرف

maktabatul-ashraf

([illegible])

[illegible], [illegible]-[illegible]

[illegible] : [illegible]-[illegible], [illegible]-[illegible]